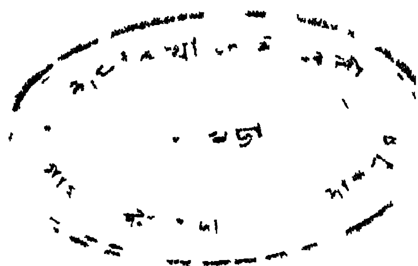


নব যৌবনের কুঞ্জবনে



শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস
৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

প্রকাশক
শ্রীতুলসীচরণ ভট্টাচার্য্য
৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

—১৩৫২—

মূল্য দুই টাকা

প্রিণ্টার—
শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ কোঙর
উমাশঙ্কর প্রেস
১২নং গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

পত্তন

আর শিশুদের খেলাঘরে নয়, জরা-কাতর প্রাচীনের বিশ্রাম-শয্যাতেও নয়, আজ নবযৌবনের কুঞ্জবনে করছি সকলকে আমন্ত্রণ! হৃদয়রক্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নবযৌবনের নামে, মানুষকে উন্মত্ত ক'রে তোলে নবযৌবনের উদ্দামতা, বিশ্বের প্রাণে মাদকতা আনে নবযৌবনের নাম! জীবন তো জাগ্রত হয় যৌবনের আলিঙ্গনেই!

নিখিল মানুষের মনের গতি চিরদিনই এগিয়ে গিয়েছে যৌবনের দিকে, তাই যুগে যুগে কবিরা গেয়েছেন যৌবনেরই প্রশস্তিগাথা, শিল্পীরা ফুটিয়ে তুলেছেন যৌবনেরই বিচিত্র সৌন্দর্য্য! যৌবনের বসন্ত জাগে প্রেমের স্পর্শে, তাই বিশ্ব-সাহিত্যের অধিকাংশ জুড়েই বিরাজ করেছে যৌবনপ্রিয় প্রেমের কাহিনী। সমালোচক যতই ক্রুদ্ধ হোন্, যৌবনের প্রেমকে ত্যাগ ক'রে পৃথিবীর সাহিত্য ও শিল্প কখনো বাঁচতে পারবে না। কবি ও শিল্পী বাস করেন কল্পনাজগতে বটে, কিন্তু মানুষের প্রাণ এতই যৌবনলোভী যে, সেই অবাস্তবতার মধ্যে গিয়েও তার চিত্ত পায় বাস্তবতার খোরাক।

কিন্তু আজ আমি এখানে এসে বসি নি কল্পনার ডালা সাজিয়ে। একটি প্রসিদ্ধ উক্তি আছে—"সত্য হচ্ছে কল্পনারও চেয়ে আশ্চর্য্য!" উক্তিটি যে কতখানি সত্য পাঠকরা তার পরিচয় পাবেন এই পুস্তকের পত্রে পত্রে। ভগবানের সত্যিকার সৃষ্টির মধ্যে গিয়ে শত কবির কল্পনাকেও হার মানতে হয়। কারণ কবিরা যে কাল্পনিক মানুষকে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন, পৃথিবীর সত্যিকার মানুষ আত্মপ্রকাশ করে তার চেয়েও বিচিত্র রূপে, রসে, ছন্দে।

এই পুস্তক থেকেই দৃষ্টান্ত দি। ধরুন, প্রাচীন যুগের ক্লাইন্ ও আধুনিক যুগের পলিন বোনাপার্টের কথা। কবি ও ঔপন্যাসিকরা অনেক ধ্যান-ধারণার পর যে কাল্পনিক আখ্যান-বস্তু গঠন করেন, এঁদের জীবন-কাহিনীর মধ্যে কি তারও চেয়ে বেশী-কিছু পাওয়া যায় না? উপরন্তু

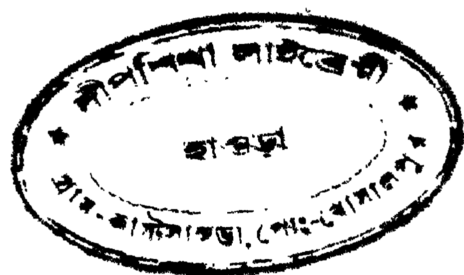
এঁকালের কোন লেখক যদি ফ্রাইন্ ও পলিনের মতন কোন চরিত্র চিত্রিত করেন, তাহ'লে সমালোচকরা কি তাকে অস্বাভাবিক ব'লে নিন্দা করতে উদ্যত হবেন না? আসল কথা হচ্ছে, পৃথিবীর ইতিহাসের কোথায় যে আরম্ভ হয়েছে সত্যের এবং কোথায় যে শেষ হয়েছে কল্পনার খেলা, এটা উপলব্ধি করা একেবারেই অসম্ভব। বরং আমি যদি বলি কল্পনাই হচ্ছে সত্য এবং সত্যই হচ্ছে কল্পনা, তাহ'লে কিছুই অন্যায় বলা হবে না।

ভারতের মানুষ সৃষ্টিছাড়া জীব নয়, এখানেও নিশ্চয় এই শ্রেণীর নানা কাহিনী সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু সে কাজ সহজসাধ্য নয়। কারণ পাশ্চাত্য দেশের শত শত লেখক এই ধরণের কাহিনীগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে যেমন আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, এদেশে তেমন আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবু ভবিষ্যতে সে চেষ্টা করবারও ইচ্ছা আছে।

যৌবনের এই শোভাযাত্রার মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে কত আলো কত ছায়া, কত উদ্দাম প্রেম, কত বন্য জীবন, কত দুর্ব্বলতা, কত ভ্রম-প্রমাদ! মানুষ প্রাণপণে উপভোগ করতে চায় চঞ্চল যৌবনকে, হাসতে হাসতে এবং কাঁদতে কাঁদতে। দুরন্ত যৌবনজলতরঙ্গে গা ভাসিয়ে মানুষ কোনদিনই শোনেনি ঋষির বাণী, নীতির আদেশ। যতই বাধা দিন, যতই নিন্দা করুন, এইটেই হচ্ছে রক্তমাংসের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম। অশ্লীল বললেও এই পরম সত্যকে অস্বীকার করা চলবে না। কারণ যেখানে আছে সত্যের প্রকাশ, সাহিত্য-শিল্পীর কর্ত্তব্য থাকে সেইখানেই। স্বীকার করি সত্য অনেক স্থলে এমন কুৎসিত, মুখে যা উচ্চারণ করাও মহাপাপ। কিন্তু যে-সত্য নোংরা বা কুৎসিত নয়, শিল্পী সেখানেই পাবে সৌন্দর্য্যের সন্ধান। এর মধ্যে দুর্নীতি বা সুনীতির কোনই প্রশ্ন উঠতে পারে না।

আমাদের সংগ্রহে আরো অনেক জীবন্ত মানুষের কাহিনী আছে। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে সব গল্প বলবার অবসর পেলুম না। এই বইখানি যদি পাঠকদের ভালো লাগে, তাহ'লে ভবিষ্যতে বাকি গল্পগুলিও বলবার চেষ্টা করব।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়


দীপশিখা লাইব্রেরী
হাওড়া



মারী আঁতোআনেং

রাণীমারী অঁাতোআনেৎ

এক

ফরাসীদের রাজা যোড়শ লুই ও তাঁর রাণী মারি অঁাতোআনেৎকে গিলোটিনে প্রাণ দিতে হ'ত না।

রাণী যদি নিজের চুল-বাঁধার সখ একদিনেরও জন্যে কিঞ্চিৎ সংযত করতে পারতেন, তাহ'লে অপূর্ণ থেকে যেত গিলোটিনের রাজরক্তক্ষুধা।

বড় বড় ইতিহাস বড় বড় কথা বলে, তাই এই ছোট তথ্যটি তার অঙ্গে ঠাঁই পায় নি।

বিদ্রোহী প্রজারা যখন রাজা রাণীকে প্রাসাদের মধ্যে বন্দী ক'রে রেখেছে, তখন তাঁরা দেশ ছেড়ে পালাবার খুব বড় সুযোগই পেয়েছিলেন। তখন যদি ঠিক সময়ে তাঁরা পালাতে পারতেন, তাহ'লে প্রজাদের হস্ত কলুষিত হ'তে পারত না রাজরক্তে।

পালাবার সব বন্দোবস্তও ঠিক হয়ে গেল। দেরি করবার এক মুহূর্ত্তও সময় নেই। কিন্তু যাত্রা করবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে দেখা গেল, রাণীর Coiffeur বা কেশ প্রসাধক তখনো এসে হাজির হয় নি। (ফরাসী দেশের প্রত্যেক বিলাসিনী তখন মোটা মাহিনায় পুরুষজাতীয় কেশ-প্রসাধক পুষ্‌তেন)

অঁাতোআনেৎ বেঁকে ব'সে বললেন, "বল কি! সে না এলে যাওয়া অসম্ভব! আমার মাথার চুল সাজিয়ে বেঁধে দেবে কে?"

সকলে বললে, "রাণীজী, ঘড়ির কাঁটা ধ'রে প্রত্যেক ব্যবস্থা করা হয়েছে। দু-চার মিনিটের হের-ফেরে সব ওলট-পালট হ'য়ে যাবে!"

সুন্দরী রাণী অটল। প্রজা-বিদ্রোহের গুরুত্ব বুঝলে না লঘু নারীত্ব।

কেশ-প্রসাধক যখন এল তখন শুভ-লগ্ন উত্তীর্ণ।

তবু রাজা-রাণী পালালেন, কিন্তু অসময়ে বেরিয়ে ধরা পড়লেন বিদ্রোহীদের হাতে।

মাথার চুলের মান রাখতে গিয়ে আঁতোআনেৎ খালি নিজের গোটা মাথাটাই বলি দিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে গেল স্ত্রৈণ রাজার মাথাও! ধন্য নারী!

দুই

আমি য়ুরোপের বিখ্যাত বহু বিলাসিনীর কাহিনী বলেছি। কিন্তু আঁতোআনেৎ ঠিক ও-শ্রেণীর বিলাসিনী ছিলেন না।

আঁতোআনেৎ ছিলেন পরমা সুন্দরী রাণী। তাঁর রূপের খ্যাতি ফিরত য়ুরোপের দেশে দেশে, লোকের মুখে মুখে। সাজ-পোষাকের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল খুব, তেমন অসম্ভব দামী সাজ-পোষাক তখন য়ুরোপের আর কোন রাণীর ছিল না। কিন্তু সাজপোষাকের ভিতর দিয়ে আঁতোআনেৎ-এর কোন রুচিই প্রকাশ পেত না, সেগুলো তিনি পরতেন অতি-অযত্নে, যার-পর-নাই এলোমেলো ভাবে।

য়ুরোপের সব-চেয়ে বিলাসী দেশের রাণীর হ'লে কি হয়, সুন্দরী আঁতোআনেৎ দেহ-ধর্ম্ম পালন করতেও ছিলেন নিতান্ত নারাজ। স্নানের ঘরে ঢুকতেন কালে-ভদ্রে কদাচ। দাঁত পর্য্যন্ত মাজতেন না! তাঁর মা, অষ্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী এজন্যে পত্রে তাঁকে বহু ভর্ৎসনা করতেন। কিন্তু সে সব বকুনি ঢুকত না তাঁর কাণে।

কেবল আঁতোআনেৎ কেন, আঠারো শতকের ফরাসী-সমাজই ছিল এজন্যে কুবিখ্যাত। তারও কিছুকাল আগেকার অবস্থা ছিল আরো জঘন্য, আরো ভয়ানক। রাজা চতুর্দ্দশ লুই স্নান করতেন বছরে একবার মাত্র। তাঁর গায়ের দুর্গন্ধে কাছে কেউ দাঁড়াতে পারত না!

তখনকার ডাক্তাররাও ছিলেন অদ্ভুত! তাঁরা বলতেন, "দেহকে বেশী মাজা-ঘষা করলে স্বাস্থ্যহানি হয়।" অতএব প্রত্যহ সকালে শ্রীমান ও শ্রীমতীরা শুকনো তোয়ালে দিযে মুখ মুছেই করতেন স্বাস্থ্যরক্ষা। নিয়মিত দাঁত মাজারও কোন বালাই ছিল না। সুন্দরীর রূপে আকৃষ্ট হযে কাছে এলে মুখের ও গাযের গন্ধে ভূতও পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে বাধ্য হ'ত! তবে সুচতুরারা এসেন্স মেখে ভক্তদের কাছে কতকটা সহনীয়া হ'তেন বটে। যেমো গায়ের ময়লার জন্যে মাথা ঘামাবার দরকার ছিল না, বঙ্‌চঙে রেশমী পোষাকের তলায় থাকত তা লুকানো।

স্নানের অভাবে দেহের যে মালিন্য, তা দূর করত রুজ ও পাউডার। আঠারো শতকের ফরাসী দেশে রুজ-পাউডার মাথার আর্ট উঠেছিল চরমে। কেবল যৌবনকে তাজা রাখবার জন্যেই ও-দুটো জিনিষ ব্যবহৃত হ'ত না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভাবে তখনকার ফরাসী-সমাজে বসন্ত-মহামারীর প্রাদুর্ভাব ছিল ভয়াবহ রূপে। এ রোগ গরীব-ধনী রাজা-প্রজা মানত না। ফরাসী দেশের রাজা ও আঁতোআনেৎ-এর শ্বশুর পঞ্চদশ লুই পর্য্যন্ত মারা পড়েছিলেন বসন্তের আক্রমণে। উচ্চ-সমাজের অসংখ্য স্ত্রী-পুরুষের মুখ ছিল বসন্তের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত। কাজেই রুজ পাউডারের পুরু প্রলেপ বিনা সে অপূর্ণতা ঢাকবার উপায় ছিল না।

কিন্তু রাণী মারি আঁতোআনেৎ-এর গায়ের ত্বক ও রং ছিল মসৃণ ও অপূর্ব্ব! নামজাদা চিত্রকররা প্রতিকৃতি আঁকতে ব'সে তাঁর গায়ের রং ফোটাবার মত বর্ণ খুঁজে পেত না।

তিনি অন্যান্য ফরাসী বিলাসিনীদের মতন ফ্যাসানের দাসীও ছিলেন না। তখনকার ফ্যাসানের কড়া হুকুম ছিল, প্রত্যেক বড় ঘরের মেয়েকে এমন ভাবে আঁটসাট 'কর্সেট' পরতে হবে, কোমর যাতে দেখায় বোল্‌তার মত সরু! আঁতোআনেৎ এ হুকুম মানেন নি।

তিন

কিন্তু আঁতোআনেৎ-এর সব চেয়ে সৌখীনতা প্রকাশ পেত কেশ-প্রসাধনে। তাঁর কেশ-প্রসাধকের মাহিনা ছিল আমাদের হাইকোর্টের জজের চেয়ে বেশী। চুল বাঁধতে যেত তাঁর কয়েক ঘণ্টা!

কেবল তিনি নন, তাঁর আশপাশের বিলাসিনীরাও সারাদিন চুল নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকতেন। সে চুল-বাঁধার কথা ভালো ক'রে খুলে না বললে বাংলাদেশের 'আপ-টু-ডেট্' দেবীর দলও কিছুই আন্দাজ করতে করতে পারবেন না! তাঁদের চুল-বাঁধা ও কেশ-সজ্জা 'ফাইন্ আর্ট' রূপে গণ্য হ'তে পারে অনায়াসেই। তার জন্যে খরচও করতে হ'ত হাজার হাজার টাকা এবং তার সৌন্দর্য্যও ছিল বিস্ময়জনক, অসাধারণ। মাথার উপরে সে যেন এক নূতন জগৎ! তাকে সম্পূর্ণ ও নিখুঁৎ করার জন্যে কেশ-প্রসাধককে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলা সম্বন্ধেও জ্ঞানসঞ্চয় করতে হ'ত।

একদিনের উৎসব সভায় দেখা গেল, আঁতোআনেৎ-এর মাথায় নাচছে তাজা গোলাপের উপর হীরা-পান্না-মরকত প্রভৃতি দিয়ে গড়া রঙিন জড়োয়ার পাখী!

তারপরেই দেখা দি·লন এক রূপসী ডাচেস্, তাঁর মাথার দিকে চেয়ে সবাই চমৎকৃত! শিল্পী কেশ-প্রসাধক তাঁর মাথায় যে দৃশ্যের অবতারণা করেছে তার বর্ণনা এই:

অপূর্ব্ব নিসর্গ-দৃশ্য ! ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগর ; তীরের কাছে সন্তরণশীল হাঁসের দল ; জনৈক শিকারী বন্দুক তুলে গুলি করতে উদ্যত ; ডাঙার উপরে একটি Mill বা পেষণ-কলঘর ; তার অধিকারীর যুবতী স্ত্রী জনৈক পুরোহিতের সঙ্গে প্রেমলীলায় মত্ত ; এবং কাণের তলায় বিলম্বিত কেশরাজির উপরে দেখা যাচ্ছে, মিলের অধিকারী একটা গাধাকে তাড়না করতে করতে নিয়ে আসছে।

সবাই মতপ্রকাশ করলে স্বামীকে লুকিয়ে কেমন ক'রে পরকীয় প্রেমসাধনা করতে হয়, ফ্রান্সে ডাচেসের মতন আর কেউ তা জানে না। কেশকলায় ডাচেস তারই একটি প্রতীক দেখিয়েছেন !

বলা বাহুল্য, কেশ-জগতের এমনি সব বহুমূল্য ও অপূর্ব্ব সৃষ্টিকে সুন্দরীরা বহু সপ্তাহ ধ'রে ধ্বংস হ'তে দিতেন না। মাথার উপরে এরকম অনাসৃষ্টি নিয়ে তাঁরা যে নড়তে চড়তে ভয় পেতেন এবং আরামে ঘুমাতেও পারতেন না, তাও অনায়াসে অনুমান করা যায় ! উপরন্তু, কেশমার্জ্জন বা মাথা ধোওয়ারও উপায় থাকত না। তখনকার মেয়েরা মাথা ধুতেন বড়-জোর বছরে একবার ! ফলে মাতার চুলের ভিতরে কিল্‌বিল্‌ করত হাজার হাজার উকুন ! আইন ছিল, প্রকাশ্য সমাজে কোন মহিলাই গা কি মাথা চুল্‌কোতে পারবেন না ! উকুনরা যখন কট্‌ কট্‌ ক'রে কামড়াতো, ফ্যাসানের মুখরক্ষার জন্যে রূপসীরা মুখ বুঁজে সেই নরক যন্ত্রণাও সহ্য করতেন ! আর একবার বলা যাক্‌, ধন্য নারী !

চার

ফরাসীদের বিশ্ববিখ্যাত প্রাসাদনগরী ভ্যার্সায়্‌, তার ঘরে ঘরে অতুলনীয় সব শিল্পরত্ন ও সাজসজ্জা, কেবল তারই বিনিময়ে রাজ্য কেনা যায়। এদেশে তেমন প্রাসাদ দেখলে লোক বলত মানুষের নয়, বিশ্বকর্ম্মার গড়া। গত প্রথম মহাযুদ্ধে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল ঐ প্রাসাদেই।

কিন্তু রাণী আঁতোআনেৎ-এর পরিচ্ছন্নতা ও যত্নের অভাবে সেখানকারও দুরবস্থা হয়েছিল অবর্ণনীয় এবং কল্পনাতীত! আধুনিক রাজপথের আঁস্তাকুড়ও তেমন নক্কারজনক ও ভয়াবহ নয়! পৃথিবীর যতরকম নোংরা জঞ্জাল তার সর্ব্বত্র সর্ব্বদা পুঞ্জীভূত হয়ে থাকত। রাজবাড়ীর শত শত ভৃত্য প্রভৃতি উঠানে ও সিঁড়ির চারিদিকে ব'সে অসঙ্কোচে মলমূত্র ত্যাগ করত। অতিথিরা সেখানে আসতেন যেতেন নাকে রুমাল চাপা দিয়ে ও হাঁটুর উপরে পোষাক তুলে বিষম সাবধানে! রাজবাড়ীর ভিতরকার আবহ ছিল দুঃসহ দুর্গন্ধে বিষাক্ত!

আঁতোআনেৎ এ সব দেখেও দেখতেন না, নিজের কেশ-প্রসাধন ও দামী দামী পোষাক আর গহনা কেনা নিয়েই তিনি ব্যতিব্যস্ত। ফরাসী রাজ পরিবারের নিজস্ব রত্নালঙ্কারের তুলনা তখন পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না। কিন্তু সে-সবেও তাঁর মন উঠত না, গহনা চাই পোষাক চাই নিত্য নূতন। পোষাকেই তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন কোটি কোটি টাকা! হাতে টাকা না থাকলে ধার ক'রে গহনা-পোষাক কিনতেও লজ্জিত হ'তেন না। এবং সেই ধার শোধবার জন্যে পারিবারিক বিখ্যাত মণি মুক্তা সস্তায় জলের দরে বেচে ফেলতেন।

আঁতোআনেৎ-এর আর এক নেশা ছিল জুয়াখেলা। জুয়া খেলেও কত দিন তিনি লক্ষাধিক টাকা নষ্ট করেছিলেন এবং জুয়ার টেবিলেও তাঁর যত টাকা উড়ে গিয়েছিল,কোন লোক তা পেলে কোটিপতি হ'তে পারত!

রাজা হাল্‌কা আমোদপ্রমোদ ভালোবাসতেন না. রাজ-কার্য্যেই নিযুক্ত হয়ে থাকতেন। রূপসী যুবতী রাণী আঁতোআনেৎ-এর তাই স্বামীসঙ্গ ভালো লাগত না। রাজার এক হাড-বখাটে ফুর্ত্তিবাজ ভাইয়ের সঙ্গে সর্ব্বদাই দেখা যেত দেশের রাণী আঁতোআনেৎকে যেখানে-সেখানে, হট্টমন্দিরেও। ফরাসী দেশে তখন অত্যন্ত কুবিখ্যাত ছিল যত সব 'অপেরা-বলে'র নৈশ আসর! বড় ঘরের কুলটা মেয়ে, তাদের উপপতি, যত

দুশ্চরিত্র, দুরাত্মা ব্যক্তি, থিয়েটারের নটী ও নিম্নশ্রেণীর গণিকার দল সেখানে অবাধে মিলে-মিশে ধরায় করত নরক সৃষ্টি! য়ুরোপের সব-চেয়ে সম্ভ্রান্ত রাণী মারি আঁতোআনেৎ সেখানেই গিয়ে নৃত্যলীলায় মেতে করতেন অফুরন্ত আনন্দের সন্ধান!

লোকে বলত, নাচের সময়ে আঁতোআনেৎ-এর পা তালে পড়ত না! কিন্তু একে তিনি দেশের রাণী, তায় রূপসী নবযৌবনা! তাই যৌবনের দালালরা হাততালি দিয়ে তারিফ ক'রে বলত, 'নাচের সময়ে তালে পা পড়াই অন্যায়!'

ফরাসী-বিপ্লবের কোন কোন ঐতিহাসিক মারি আঁতোআনেৎ-এর পক্ষসমর্থন করেছেন। কিন্তু প্রজাদের পক্ষ নিয়েও বলবার কথা আছে অনেক।

পাঁচ

তারপর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় সেই দিন!

লক্ষ লক্ষপ্রজার অভিশাপ কুড়োতে কুড়োতে রাজপথ দিয়ে চলেছেন মৃত্যুশকটে চ'ড়ে দেশের রাণী বন্দিনী মারি আঁতোআনেৎ! সেদিন তিনি কেশ-প্রসাধকের জন্যে অপেক্ষা করেন নি, করবার দরকারও ছিল না। কারণ কারাগারে যাবার পর কয়েক দিনের মধ্যেই আতঙ্কে ও দুর্ভাবনায় বিপথগামিনী অভাগিনীর মাথার সব কালো চুল হয়ে গিয়েছিল ধব্‌ধবে সাদা! খাটো চুল, কারণ নিজের হাতেই তিনি কাঁচি দিয়ে চুল কেটে ফেলেছিলেন, ঘাড়ে গিলোটিনের খাঁড়া পড়বার সুবিধা হবে ব'লে! অদৃশ্য তাঁর জড়োয়ার গহনা, অদৃশ্য তাঁর অমূল্য পোষাক-পরিচ্ছদ! সাদা পোষাকের তলায় কালো রঙের জীর্ণ 'পেটি কোট', তার উপরে সাদা মস্‌লিনের একখানি শাল! হাতদুখানি দড়ী দিয়ে পিছমোড়া ক'রে

বাঁধা! দেহের যৌবন ভয়ে পলাতক। শ্রান্ত মুখ মড়ার মতন সাদা—কিন্তু রাজ্ঞী-মহিমায় প্রশান্ত। মৃত্যুর পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তেও মারি আঁতোআনেৎ এতটুকু কাতরতা প্রকাশ করেন নি। তখন তিনি আর ক্ষুদ্র সাধারণ নারী নন, মৃত্যুজয়ী মৌনবাক মহিমময়ী মহারাণী! শেষ-দিনেই আত্মপ্রকাশ করেছিল তাঁর অসাধারণ নারীত্ব!

মাদাম দ্যু'বারী

একখানা ইংরেজী ছবির কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে দেখি, চলচ্চিত্রে মাদাম দ্যু'বারী আবার রূপ ধরেছেন। মাঝে মাঝে সিনেমায় যাই বটে (এবং অধিকাংশ সময়ে বাধ্য হয়েই), কিন্তু সেখানে আমার সঙ্গে এখনো মাদামের দেখা হয়নি। সুতরাং ছবির জগতে তিনি কতখানি গোলমাল করতে পেরেছেন আমার তা জানা নেই। কিন্তু আঠারো শতাব্দীর ফরাসী দেশে আরো কয়েকজন লোকের সঙ্গে দ্যু'বারী এমন বিষম গণ্ডগোল তুলেছিলেন যে, তখনকার য়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজ-সিংহাসনেরও ভিত্তি হয়ে গিয়েছিল শিথিল।

ঐ দ্যু'বারীর সঙ্গে কেবল ফরাসী সাম্রাজ্য, ফরাসী সম্রাট ও ফরাসী বিপ্লব নয়, জনৈক বাঙালী যুবকের নাম ও অভিন্নসূত্রে গাঁথা আছে, এ কথা হয়তো সবাই জানেন না। আঠারো শতাব্দীর ফরাসী বিপ্লবের রক্তপ্লাবিত নাট্যশালায় এক বাঙালীর ছেলেও যে অভিনেতা রূপে অবতীর্ণ হয়েছিল, একথাও অনেকে হয়তো বিশ্বাস করতেই পারবেন না। কিন্তু এটা সত্য কথা। তাই দ্যু'বারীর নাম শুনলেই ঐ বাঙালী ছেলেটির কথা আমার মনে হয়। জানিনা, "দ্যু'বারী" চিত্রে তাকে কোন মূর্ত্তিতে দেখানো হয়েছে



মাদাম দ্যু'বারী



কি না। কিন্তু কোন-না-কোন মূর্ত্তিতে তাকে না দেখালে চলবেই না, কারণ দ্যু'বারীর সঙ্গে সে থাকত ছায়ার মত, সর্ব্বদাই।

ঐ বাঙালীর ছেলেটির কথা বলতে গেলে দ্যু'বারীর কথাও কিছু কিছু বলতে হয়। কারণ সে দ্যু'বারীর সঙ্গে সঙ্গে ছিল ব'লেই সকলে তাকে চেনে। পৃথিবীর বিখ্যাত পটুয়ারা দ্যু'বারীব যে-সব প্রসিদ্ধ তৈলচিত্র এঁকেছেন তার ভিতরেও দেখি দ্যু'বারীর সঙ্গে ঐ বাংলার ছেলে অমর হয়ে আছে।

Jeane প্রথমে ছিল দাসী, তারপরে কাজ নেয় দরজীর দোকানে। তখন থেকেই তার অপরূপ রূপগৌরবে ও যৌবনপুষ্পসৌরভে আকৃষ্ট হয়ে আসত বহু মধুকর, কিন্তু দুদিন পরেই অকূলে ভেসে যেত তার প্রবল যৌবন-প্রবাহে। সমাগত মধুকরদের চেয়েও তার মন ছিল বেশী চঞ্চল। তারপর এই রূপসীর দিকে দৃষ্টি পড়ল দ্যু'বারী নামে এক লম্পট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির। তাঁর উপপত্নী রূপে সে রাজ্যের যত আমীর ও ওমরাওর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেললে। ক্রমে রাজা পঞ্চদশ লুই তাকে দেখলেন এবং দেখেই হৃদয় হারিয়ে ফেললেন। কিন্তু সাধারণ গণিকাকে রাজবাড়ীতে এনে রাখলে আদব-কায়দা সহ্য করে না, অতএব রাজার হুকুমে ও বখসিসের মোহে কাউণ্ট দ্যু'বারী Jeaneকে লোক-দেখানো বিয়ে ক'রে কুলীন সমাজে জাতে তুলে রাজার হাতে সমর্পণ ক'রে নিজে স'রে দাঁড়ালেন। সেইদিন থেকে তার নাম হ'ল দ্যু'বারী।

রাজার উপপত্নী হয়েও দ্যু'বারী তার আগেকার প্রেমাস্পদ বন্ধুদের ভুললে না, রাজবাড়ীতে তারা অবাধেই আনাগোনা করতে লাগল। দ্যু'বারীর শত্রুরা তার বিরুদ্ধে রাজার কাণে বিষম সব অপরাধের কথা তুললে। রাজা কিন্তু হেসে বললেন, "দ্যু'বারী হচ্ছে অসীম সুন্দরী; তাকে দেখে আমি আনন্দ পাই, আমার পক্ষে সেইটুকুই যথেষ্ট।" মোট কথা, বুড়ো রাজা একেবারেই এই যুবতীর গোলাম হয়ে পড়লেন।

দ্যু'বারীর পায়ের তলায় সমস্ত ফরাসী সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য এনে ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল। তার প্রাসাদের চারিদিকে মণিমাণিক্যের চোখ ধাঁধানো বাহার। সে ব্যবহার করে কেবল সোনার তৈজসপত্তর! কেবল তার ড্রেসিং টেবিলের সাজসজ্জার জন্যেই আসে নয় মণ সুবর্ণের স্তূপ। তার একটি ভঙ্গুর কফির পিয়ালার দাম হাজার হাজার টাকা। জামা-কাপড়ের জন্যে সে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। দ্যু'বারীর মুখের একটি কথায় বড় বড় মন্ত্রীর চাকরি যায়। রাজার চেয়েও তার শক্তি বেশী, কারণ তাকে খুসি করতে না পারলে কেউ রাজানুগ্রহ লাভ করতে পারেনা।

সে সময়ে ফ্রান্সের বিলাসিনী ধনীর ঘরণীরা প্রত্যেকেই এক-একজন কাফ্রী চাকর পুষতেন—এখনকার বিলাসিনীরা যেমন লোমশ কুকুর পোষেন। মাদাম দ্যু'বারীও একজন বালক ক্রীতদাস রাখলেন। তখনকার ফিরিঙ্গী বোম্বেটে ও দাস-ব্যবসায়ীরা সাধারণত আফ্রিকা থেকেই এই সব ক্রীতদাসকে জোর ক'রে অর্থাৎ চুরি ক'রে ধরে আনত। এইজন্যে তখনকার অধিকাংশ ফরাসী লেখকই দ্যু'বারীর ক্রীতদাসকে কাফ্রী বলেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারপরে প্রকাশ পেয়েছে, দ্যু'বারীর এই ক্রীতদাসের গায়ের রং কালো হ'লেও সে মোটেই কাফ্রী নয়, ফিরিঙ্গী বোম্বেটেরা ছেলেবয়সেই তাকে সুদূর বাংলাদেশ থেকে চুরি ক'রে এনেছিল।

ঐ কালো ছেলেটির নাম আজ আর কেউ জানেনা। হয়তো সবুজ বাংলাদেশে তার বাপ-মা তকে 'কেলো' বা 'ভুলো' বা 'কানাই' বা 'নিতাই' ব'লে ডাকত, কিন্তু সে ফরাসীদেশে নির্ব্বাসিত হবার পর Prince de Conti তার নূতন নাম রাখলেন—"জামোর"! কানাই বা নিতাই জামোর হ'ল বটে, কিন্তু বাংলাকে যে ভুলে গেছিল, এমন অনুমান করবার কারণ আছে।

জামোরকে দ্যু'বারী এত ভালোবাসে যে একদণ্ড চোখের আড়াল করতে পারেনা। রাজা যখন দ্যু'বারীর সঙ্গে প্রেমালাপ করেন, তখন সেখানে রাজ্যের কোন প্রধান ব্যক্তিও আসতে পারতেন না, কিন্তু জামোর তখনো দ্যু'বারী বা রাজার পায়ের কাছে ব'সে খেলা করত। পশুপক্ষীকে যেমন আমরা গ্রাহ্য করিনা, শ্বেতাঙ্গরাও নিগ্রোকে তেমনি মানুষ ব'লে গণ্য করেনা। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের ছোট বোন সুন্দরী পলিনের উলঙ্গ দেহ একজন নিগ্রো ক্রীতদাস কোলে ক'রে উঁচু স্নানের চৌবাচ্ছায় ঢুকিয়ে দিত। তাইতে পলিনের নামে কুৎসা রটনা হওয়ায় সে বিস্মিত হয়ে ব'লেছিল, "নিগ্রো কি আবার পুরুষ মানুষ!"

খুব সম্ভব জামোরকেও মানুষ বলে ধরা হ'তনা। কিন্তু সে বাঙালীর ছেলে, শত আদর-যত্ন পেয়েও তার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে দ্যু'বারীর এই নির্বিকার ভাব দেখে সে যে মনে মনে দারুণ অপমানবোধ করত পরে সে প্রমাণও পাওয়া গিয়েছিল।

* * *

যার কৃপাকটাক্ষ লাভ করার জন্যে ফরাসী দেশের সমস্ত আমীর-ওমরাওরা উন্মুখ হয়ে আছেন, জামোর সেই অদ্বিতীয়া দ্যু'বারীর আদরের দুলাল। রাজপ্রাসাদে তার অবাধ গতি, বড় বড় আমীর-ওমরাওরা পর্যন্ত ভয়ে তাকে খুসি রাখবার চেষ্টা করতেন। খাঁটি সোনার কাজ-করা রঙিন পোষাক প'রে জামোর ঘরে ঘরে হেলে দুলে নেচে খেলে বেড়ায়। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক Goncourt লিখেছেন:

"There was even a black servant, who was regarded as a sort of human monstrosity, and handed round the dishes and refreshments, carried parasols, and turned somersaults—one of those little monsters so beloved by the exotic taste of the eighteenth century, which

regarded the negro, so to speak, as a little two legged animal."

জামোরকে মনে করা হ'ত বিকৃতদর্শন, মনুষ্যত্বের নমুনা দু-পেয়ে জন্তুর মত! বাংলার ছেলে জামোর যে শ্বেতাঙ্গদের এই মনের ভাব বুঝে এত আদর-যত্নেরও সৌভাগ্যের মধ্যেই মরণাধিক যন্ত্রণা বোধ করত এবং সমস্ত ঐশ্বর্য্যই তার সর্ব্বাঙ্গে বিঁধত কাঁটার মত, এটুকু কল্পনা করাও কঠিন নয়।

* * *

রাজার ছিল অনেক প্রাসাদ এবং প্রত্যেক প্রাসাদেই সর্ব্বময় কর্ত্তারূপে থাকতেন একজন ক'রে গভর্ণর। এই গভর্ণরের উচ্চপদে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ নিযুক্ত হতেন না। দ্যু'বারী একদিন আবদার ক'রে রাজাকে বললে, "Luciennes প্রাসাদে আমার জামোরকে গভর্ণর ক'রে দিতে হবে।" রাজা সবিস্ময়ে বললেন, "বল কি প্রিয়তমে! দেশের লোক কি ভাববে? অন্যান্য সম্ভ্রান্ত গভর্ণরেরা কি ভাববেন?" দ্যু'বারী বললে, "আমি তাদের ভাবনার ধার ধারিনা। আমি অন্যান্য গভর্ণরদের দেখাতে চাই, আমার চোখে তারা জামোরের চেয়ে বড় নয়।" দ্যু'বারীকে অদেয় রাজার কিছুই নেই, রাজা বললেন—"তথাস্তু"। সেইদিন থেকে জামোর হ'ল রাজা পঞ্চদশ লুইর পল্লীপ্রাসাদের গভর্ণর, তার মাসমাহিনা প্রায় চারশো টাকা। সে যুগে চারশো টাকার দাম ছিল এখনকার চেয়ে অনেকগুণ বেশী।

* * *

কিন্তু এই অযাচিত অনুগ্রহের গূঢ় কারণ কি বাঙালীর ছেলে জামোরের কাছে অজ্ঞাত ছিল? সে কি বুঝতে পারেনি যে, এ অনুগ্রহ হচ্ছে নিগ্রহের ও এ সম্মান হচ্ছে অসম্মানের নামান্তর? যে হচ্ছে রাজ-গণিকার কাছে পোষা কুকুর-বিড়ালের মতই আদরের জন্তু, তাকে উচ্চ-

পদে বসিয়ে দ্যু'বারী তার মনুষ্যত্বের ও যোগ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা দেখালে না, রাজ্যের উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করবার জন্যেই তার ঘৃণ্য নগণ্যতাকে ব্যবহার করা হ'ল। সেদিন তার কালো চামড়ার তলায় মানুষের প্রাণ যে রুদ্ধ আক্রোশে কতটা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল এবং প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্যে, মনে মনে সে যে কী প্রতিজ্ঞা করেছিল, মনুষ্য-চরিত্রে যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরাই তা উপলব্ধি করতে পারবেন। কিন্তু জামোরের মুখ দেখে সেদিন কিছুই বোঝা যায়নি! Goncourt কেবল ইঙ্গিত করেছেন, "পল্লীপ্রাসাদ হ'ল জামোরের কাছে বনের পাখীর সোনার খাঁচার মত।" জামোর হচ্ছে সুদূর বাংলার শ্যামল বনভূমির দুলাল, সেখান থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যারা শীতার্ত্ত ফ্রান্সের রাজপ্রাসাদে বন্দী ক'রে রেখেছে, শত অনুগ্রহেও তাদের প্রতি সে কৃতজ্ঞ হ'তে পারেনা। জামোর প্রতিহিংসার দিন গুণতে লাগল।

* * *

পট পরিবর্ত্তন হ'ল। লম্পট পঞ্চদশ লুই পরলোকে গেলেন। নূতন রাজা নূতন রাণী দ্যু'বারীকে এক মঠে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তখনো সে যুবতী এবং হাতে তার বিপুল বিত্ত। মঠ তার ভালো লাগবে কেন, মঠ ছেড়ে বেরিয়ে এসে আবার সে বিলাসের স্রোতে ফুলের মালার মত ভেসে চলল। এ সময়েও জামোর তার পোষা ছিল কিনা আমাদের জানা নেই। হয়তো রাজার মৃত্যুর পরেই জামোর সোনার খাঁচা থেকে অদৃশ্য হয়েছিল।

* * *

পরে পরে কয়েক বৎসর কেটে গেল - ফরাসীদেশে বিপ্লবের বিজয়-ভেরী বেজে উঠল। রক্তের সাগরে ডুবে গেল রাজ-রাণীর—মুকুটপরা মাথা! এতদিন ধ'রে যারা গরীব প্রজাদের রক্তশোষণ ক'রে তাদেরই জীবন্মৃত দেহের উপরে দাঁড়িয়ে পৈশাচিক নৃত্য ক'রে এসেছে, আজ

তাদের জবাবদিহি করবার জন্তে ডাক পড়ল! ফরাসীরা দ্যু'বারীকেও ভুললেনা, গরিবদের কষ্টার্জ্জিত অর্থ আজও তার বিলাসের উপকরণ জোগাচ্ছে, তার আবদারে রাজা অনেক অবিচার অনেক অত্যাচার করেছেন। বন্দিনী দ্যু'বারী বিচারালয়ে গিয়ে সবিস্ময়ে ও সভয়ে দেখলে, তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে এসেছে জামোর!..... স্বদেশ-হারা জমোর, সোনার খাঁচায় বন্দী মানুষ জামোর, খেলার পুতুল, "দুপেয়ে জন্তু" জামোর। কিন্তু সেদিন তার পায়ে আর সোনার শিকল ছিলনা, সেদিন তার চক্ষে ছিল বাংলার জাগ্রত, অপমানিত, আহত মনুষ্যত্ব! সে একে একে দ্যু'বারীর সমস্ত কুকীর্ত্তি প্রকাশ ক'রে দিলে।

শেষ-অঙ্কের যবনিকা পড়বার আগে উঠল। রাজপথ দিয়ে চলেছে মৃত্যু-শকট, তার উপরে বিগতযৌবনা দ্যু'বারী—তার তীব্র ও তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠছে বিপুল জনতার ঘন ঘন অভিশাপ-বাণী! সে উচ্চবংশীয়া বীর নারীর মত সগর্ব্বে মরতে পারলে না, চীৎকার ক'রে বললে, "জীবন, জীবন! আমার জীবন ফিরিয়ে দিলে আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমাদের দান করব!" জনতার ভিতর থেকে কে নিষ্ঠুর ভাষায় জবাব দিলে, "তোমার যথাসর্ব্বস্ব তো আমাদেরই নিজস্ব সম্পত্তি। সাংঘাতিক গিলোটিন তাকে গ্রহণ করবার জন্তে প্রস্তুত! জল্লাদ যত তাকে গিলোটিনের দিকে টেনে নিয়ে যায়, দ্যু'বারী ভয়ে পাগল হয়ে ততই তাদের হাত ছাড়িয়ে—পালিয়ে আসতে চায়! যখন জোর ক'রে তার গলা হাঁড়ি কাঠে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল, তখনো সে হাপুস চোখে কাঁদতে কাঁদতে চীৎকার করছে, "বাঁচাও, বাঁচাও! দয়া কর!" কিন্তু কেউ সাহায্য করলে না, কেউ দয়া করলে না। গিলোটিনের খড়্গ নেমে এসে বিপথচারিণী হতভাগিনীর কণ্ঠ নীরব ক'রে দিলে।

যবনিকা পড়বার সময়ে জামোর কোথায় ছিল? যবনিকা পড়বার পর জামোর কোথায় গেল? পায়ে সোনার শিকল প'রে বাঙালী জামোর



ইসাডোরা ডানকান

ফরাসী চিত্রকলায় ও সাহিত্যে অমর হয়ে আছে, কিন্তু পায়ের শিকল খুলে সে কোথায় অদৃশ্য হ'ল, সে কথা নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় নি।

ইজাডোরা ডানকান

আধুনিক পৃথিবীতে গ্রীক নৃত্যকলা আবার যিনি ফিরিয়ে এনেছেন, এবারে সেই ইজাডোরা ডানকানের কথা হবে। ইজাডোরার আত্মচরিত কিছুকাল আগে পৃথিবীর শিল্পী-সমাজে আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল এবং তার মধ্যে তিনি নিজের কথা যতটা পারেন বেশ স্পষ্ট ক'রেই বলবার চেষ্টা করেছেন। তা পাঠ ক'রে তাঁর জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিক ও শিল্পী মাথা নীচু করতে বাধ্য হয়েছেন, অনেক সাধারণ লোক বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, এবং অনেক নীতিবাগীশ লজ্জায় ঘৃণায় শিউরে উঠেছেন। তাঁর সম্বন্ধে আরো নানা শ্রেণীর লোক এত কথা লিখেছেন যে, সে গুলিকে একত্র করলে বৃহৎ একটি সাহিত্য সৃষ্টি হ'তে পারে। কবি, লেখক, চিত্রকর, গায়ক ও অভিনেতা যিনিই তাঁকে দেখেছেন, তিনিই বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন এবং এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়, ইজাডোরার ব্যক্তিত্বের মহিমা ছিল কতখানি। তাঁর শেষ-জীবন সম্বন্ধে বিখ্যাত লেখক এবং সাংবাদিক জর্জ্জ সেল্ডেস যে সুন্দর আলোচনা করেছেন, আমরা এখানে তারই কতকাংশ প্রকাশ করলুম।

"প্রথম যখন ইজাডোরা ডানকানকে দেখি, তখন আমি শিশু। তখন থিয়েটারের সব কিছুই আমাকে বিস্মিত করত। সেদিন আমার তরুণ চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন ইজাডোরা, প্রাচীন গ্রীসের দেবী ডায়না ও ভেনাসের মত। সেই দিনই আমি এই আশ্চর্য্য মেয়েটির

প্রেমে পড়ে গেলুম। তার বহুদিন পরে দেখলুম ইজাডোরাকে। বার্লিনের একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেলের একটি সস্তা ঘরে তিনি তখন আশ্রয় নিয়েছেন, কিন্তু সেখান থেকে পালাবার উপায় তাঁর নেই, কারণ পাওনা মিটিয়ে না দিলে হোটেলওয়ালা তাঁকে ছাড়বে না! সেদিন তাঁর দৃষ্টি ক্ষীণ, দেহ মোটা, কথাবার্ত্তা স্বরাষ এলোমেলো! এ পরিবর্ত্তন আমাকে ব্যথা দিলে।

আমি খবরের কাগজের রিপোর্টার রূপে গিয়ে ছিলুম। ইজাডোরা বললেন, 'আপনাদের কাগজ যে মেয়ে রিপোর্টার পাঠায় নি, এজন্যে খুসি হয়েছি। নারীরা অন্য নারীর উপরে নিষ্ঠুর হয়; আর তাদের বিশ্বাস করাও যায় না।.........হ্যাঁ, ভালো কথা! আমাকে কিছু মদ আনিয়ে দিতে পারেন?"

"ঘণ্টা বাজিয়ে হোটেলের চাকরকে ডাকলুম। তার রকম-সকম দেখে বেশ বোঝা গেল, অনেকদিন বখ্‌সিস পায় নি ব'লে ইজা-ডোরার উপরে সে মোটেই খুসি নয়।

ইজাডোরাকে জিজ্ঞাসা "করলুম, কি আনাব? ওয়াইন, বিয়ার না কক্‌টেল?

জাইডোরা বললেন, "এক বোতল জিন।"

চাকর আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "দাম আপনি দেবেন তো?"

—হ্যাঁ।"

মদ এল। একেবারে আধগ্লাস মদ ঢেলে নিয়ে সমস্তটা পান ক'রে ইজাডোরা প্রথমেই বললেন, "এমন কোন আর্ট নেই যাতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয় না।"

তারপর একরাশ প্রেমপত্র দেখিয়ে বললেন, "দুনিয়ার এখন আমার নিজের বলতে আছে খালি ঐ প্রেমপত্রগুলি। কিন্তু এগুলোও বোধহয় আমাকে বেচে ফেলতে হবে! ......আমার প্রেম পত্রের সংখ্যা প্রায়

বারো হাজার। কিন্তু আজ আমার কোন বন্ধু নেই। আগে আমার বাড়ীর দরজা সকলের জন্যে খোলা থাকত। আমার ঘরে বন্ধু আর ভক্ত ধরত না—অন্তত তাদের মুখে শুনতুম তারা আমার বন্ধু, আমার ভক্ত! তারা আমার জয়গান করত; আমার পয়সায় মদ আর খাবার খেত। তাদের জন্যেই আমার সব টাকা উড়ে গেছে, কারণ আমি টাকার দাম জানতুম না। কিন্তু আজ আমাকে সাহায্য করবার কেউ নেই।

আজ আমি গরিব। তাই আমি স্থির করেছি এই সব বিখ্যাত লোকের লেখা প্রেমপত্র বিক্রী করব। এগুলো প্রকাশিত হ'লে অনেক নামজাদা লোকের খ্যাতি কাহিল হ'য়ে পড়বে। অবশ্য, তাঁদের মধ্যে যাঁরা প্রতিভাবান, তাঁদের কোনই ক্ষতি হবে না। যেমন গর্ডন ক্রেগ, তাঁর প্রেমপত্র বেরুলে তিনি গ্রাহ্যই করবেন না। কিন্তু সবাই তো আর গর্ডন ক্রেগ নয়!............আপনি প্রেমপত্রগুলো দেখবেন?"

ইতালির কবি দানুনসিয়ো এবং বিলাতের শিল্পী ও সাহিত্যিক গর্ডন ক্রেগের প্রেমপত্র দেখলুম। গর্ডন ক্রেগের লেখা প্রেমপত্রগুলো আর্টের নিদর্শন। ছবি আর কথা একসঙ্গে! আরো অনেকের পত্র দেখলুম - কেউ শিল্পী, কেউ কবি, কেউ ব্যবসায়ী!

প্রত্যেকেই আবেগে উচ্ছ্বসিত! এবং প্রত্যেকেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ইজাডোরাকে কেবল এই কথাই জানাতে চেয়েছেন যে, "প্রথম দিন তোমাকে যেমন সুন্দর ও অমূল্য নিখিল-মণ্ডন দেখেছিলুম, আজও তোমাকে তেমনই দেখছি! পৃথিবীর মধ্যে তুমিই হচ্ছ একমাত্র নারী, যাকে ভোগ ক'রেও কামনার ক্ষুধা কমে না!"

আবার মদ্য পান ক'রে ইজাডোরা বললেন "যে কেতাবে চিঠিগুলো বেরুবে তার কি নাম দেব জানেন—'প্রেম বলতে বিভিন্ন ব্যক্তি কি বোঝে'? কবির প্রেম, নাট্যকারের প্রেম, ব্যাঙ্কওয়ালার প্রেম, গরিবের প্রেম, অলস ধনীর প্রেম! এক এক পরিচ্ছেদে এক শ্রেণীর প্রেমপত্র থাকবে!"

আমি ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপি কিনতে চাইলুম। ইজাডোরা লিখতে রাজি হ'য়ে বললেন, "কিন্তু কি ক'রে আমি লিখব? আগে আমাকে খাবার দাও, মদ দাও। একজন সেক্রেটারি চাই—আমি বলব, সে লিখবে! আর আমি কাজ সুরু করব দুপুর রাতে! জীবন সুরু হয় দুপুর রাতেই! স্বাস্থ্যকর দিনের আলো হচ্ছে স্বাস্থ্যকর নিদ্রার জন্যে!"

ইজাডোরা আমার জন্যে বই লিখতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সেক্রেটারি রূপে একটি ইংরেজ মেয়েকে পাঠালুম। কিন্তু পরদিনেই সে এসে জানালে, "শ্রীমতি ডানকানের নীতি আমি পছন্দ করি না। যে নারী জিন্ মদ খায়, তার কাজ করতে আমি রাজি নই।"—নূতন লোক পাঠালুম। ইজাডোরা গৌরচন্দ্রিকা লিখে ফেললেন, কিন্তু তারপরই লেখা বন্ধ হ'ল!

হপ্তাখানেক পরে হোটেলে গিয়ে দেখি, ভারি ধুম-ধাড়াক্কা! নূতন ট্রাঙ্ক এসেছে, দাসীরা জিনিসপত্র গুছোচ্ছে, ইজাডোরা হাসিমুখে তত্ত্বাবধান করছেন! ব্যাপার কি? ইজাডোরা বললেন, "আমি বায়ু-পরিবর্ত্তনে যাচ্ছি। আমি শরীর ভালো করতে চাই। আমি মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আমি আবার কোন থিয়েটারে নাচ দেখাব। আপনি দেখতে আসবেন।"

—"কিন্তু আপনার বই লেখার কি হ'ল?"

—"ও, চুলোয় যাক্ বই! আমার স্মৃতিকথা এখন প্রকাশ করব কেন? আপনি আমাকে কি ভেবেছেন? বুড়ী? মৃত? যারা জ্যান্তে মরা, স্মৃতি কথা বের করে তারাই। আমিও যখন জ্যান্তে মরা হব, আমার স্মৃতিকথা লেখবার প্রচুর সময় পাব। এখন আবার সুদিন এসেছে—আবার আমি জীবন সুরু করব!"......আমি ভিতরে ভিতরে খোঁজ নিয়ে জানলুম, ইজাডোরা তাঁর প্রেমপত্র প্রকাশ করবেন শুনেই কোন

ব্যক্তির টনক নড়েছে এবং তিনিই আবার তাঁকে কাজ জোগাড় ক'রে দিয়েছেন।

একদিন ইজাডোরার নাচ দেখতে গেলুম।……ইজাডোরা রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হ'লেন প্রাচীন গ্রীক নারীদের ঢলঢলে পোষাক প'রে। এ পোষাক তন্বী যুবতীর দেহে চমৎকার দেখায়, কিন্তু ইজাডোরার প্রকাণ্ড নত স্তন, স্ফীত ভুঁড়ি ও বিপুল নিতম্বের পক্ষে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। একদিন তাঁর সুন্দর বাহুর ভাবাভিব্যক্তি চোখ দিত জুড়িয়ে, কিন্তু আজ তা স্থূল এবং আঁচিলে ও তিলে দাগী। তাঁর মুখের মাংসও ঝুলে পড়েছে।…… তারপর নাচের বাজনা বাজল, নাচ সুরু হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ইজাডোরার কী পরিবর্ত্তন! রঙ্গমঞ্চের উপর আর সেই লাবণ্যহীনা নারীকে দেখতে পেলুম না—দেখলুম এক অদ্ভুত অতি-মানবীকে। গতি অতি, অতি মন্থর। কল্যাণসুন্দর মুখের ভাব সঙ্গীতের তানের সঙ্গে বদলে যাচ্ছে! বাহু, পদ, দেহ হেলে হেলে পড়ছে, মুখ উঠছে আর নামছে এবং চোখ দুটি দিয়ে এমন এক বিচিত্র স্বর্গীয় কিরণ বিকীরিত হচ্ছে, যা দেখলে পার্থিব, দুর্ব্বল ও জরাগ্রস্ত নরদেহের স্মৃতি মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়! এ নাচ নয়, এ হচ্ছে সঙ্গীতের মোহনীয় ভাবের অভিব্যক্তি এবং এ দেখলে বোঝা যায়, নৃত্যকলাও সোফোক্লেসের গ্রীক ট্রাজেডির সমস্ত ভাব নিঃশেষে ফুটিয়ে তুলতে পারে!…তারপর সঙ্গীতের বিরাম, ইজাডোরার বিরাম, ইন্দ্রজালের বিরাম! চারিদিক স্তব্ধ। আমরা এমন অভিভূত যে, প্রশংসা করতে বা করতালি দিতে পারলুম না।

নাচের শেষে ইজাডোরার কাছে গেলুম। তিনি বললেন, "আমি আবার বাঁচতে সুরু করেছি।"

তাঁর পুস্তকের কথা মনে করিয়ে দিলুম।

তিনি বললেন, "আমি এখনো মরিনি। যখন মরব তখন টাকার

জন্তে স্মৃতিকথা লিখব। এখন আমি সুখী। অসুখী না হ'লে বই লিখব না। এখন আমি খালি নাচ্‌ব।"

আর এক বছর কেটে গেল। আবার অর্থহীনা হয়ে ইজাডোরা একখানি বই লিখতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু শেষ করতে পারলেন না। পারিসের রাজপথে হঠাৎ এক মোটর-দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল।

শয্যা যার রাজপথ

ফ্রাইনকে চেনেন? যুগে যুগে কবি ও গীতী যার গান গেয়েছেন, গ্রীসের অতুলনীয় ভাস্কর Praxiteles যার মূর্ত্তি গড়েছেন এবং ফরাসী কবি De Musset যাকে এই ব'লে চিনিয়ে দিয়েছেন—"অশুদ্ধ ফ্রাইন্—শয্যা যার রাজপথ ?"

হঠাৎ আমার টেবিলের উপরে মেডিচি ভেনাসের মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল। শোনা যায়, এ মূর্ত্তিটির আদর্শ হচ্ছে Praxitelesএর গড়া 'ভেনাস' মূর্ত্তি। এবং সকলেই জানেন Praxiteles দেবী ভেনাসকে আবিষ্কার করেছিলেন গণিকা ফ্রাইনের দেহের ভিতরেই—অর্থাৎ ভাস্কর অসীম-সুন্দর এক গণিকার দেহ গ'ড়ে তাকেই দেবী ভেনাস নামে চালিয়ে দিয়েছিলেন।

কত শত বৎসর আগে সুন্দরী ফ্রাইনের নশ্বর দেহ পৃথিবীর সাধারণ ধূলোয় মিশিয়ে গেছে। কিন্তু শিল্পীর স্বর্গীয় প্রতিভার স্পর্শে গণিকার দেহ আজ পবিত্র ও অক্ষয় হয়ে বিরাজ ক'রছে ঘরে ঘরে। এমন কি খৃষ্টধর্ম্মের পুরোহিত পোপও তাঁর প্রাসাদে গণিকার এই মূর্ত্তিটিকে আদর ক'রে সাজিয়ে রেখেছেন। আজ এই ফ্রাইনের গল্প বলব।

একদিক দিয়ে ফ্রাইন ছিল উচ্চশ্রেণীর বারবনিতা। কাব্যে, সঙ্গীতে ও নৃত্যে ছিল তার চমৎকার পটুতা। সাহিত্যিক, নাট্যকার, কবি, দার্শনিক ও শিল্পীরা সর্ব্বদাই প্রকাশ্যে তার ঘরে আনাগোনা করতে লজ্জিত হতেন না। বিশেষ ক'রে অমর ভাস্কর Praxiteles তাকে এতটা ভালোবাসতেন যে, ফ্রাইনের অতুলনীয় দেহকে তিনি মর্ম্মরপটে চিরস্থায়ী ক'রে নিজের শিল্পী-প্রাণের গভীর অনুরাগের জ্বলন্ত নিদর্শন রেখে গিয়েছেন।

ফ্রাইনের সঙ্গলাভ ক'রে পরিতুষ্ট হয়ে Praxiteles একদিন বললেন, "বান্ধবী! তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য তোমার পায়ের তলায় বিলিয়ে দিতে পারি।"

ফ্রাইন বললে, "বন্ধু, তোমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য বলতে আমি বুঝি তোমার হাতে গড়া মূর্ত্তিগুলি। কিন্তু তার মধ্যে কোন্ মূর্ত্তিটিকে তুমি সব চেয়ে ভালো ব'লে মনে কর?"

শিল্পী বললেন, "আমার চোখে আমার সব মূর্ত্তিই সমান সুন্দর। তার ভিতর থেকে যেটি খুসি তুমি বেছে নাও।"

কিন্তু শিল্পীর এ উত্তরে চতুর ফ্রাইন ভুললেন না। তখন শিল্পীর চোখে কোন্ মূর্ত্তিটি সব চেয়ে সুন্দর তা জানবার জন্যে তিনি এক কৌশল অবলম্বন করলেন।

একদিন শিল্পী ও ফ্রাইন দু'জনে ব'সে আছেন, এমন সময়ে এক ভৃত্য ব্যস্ত ভাবে এসে শিল্পীকে ডেকে বললেন, "আপনার শিল্পশালায় আগুন লেগেছে!"

শিল্পী উৎকণ্ঠার সঙ্গেবি'লে উঠলেন, "অ্যাঁঃ! "বল কি? যাও, যাও, শাগগির যাও, যেমন ক'রে পারো আগে আমার Eros-এর মূর্ত্তিটা বাঁচাও!"

ফ্রাইন হেসে বললে, "ভয় নেই বন্ধু, ভয় নেই! আমারই অনুরোধে আগুন লাগার এই মিথ্যে খবর তোমাকে দেওয়া হয়েচে! এতক্ষণে বোঝা গেল, Eros-এর মূর্ত্তিকেই তুমি সব চেয়ে সুন্দর ব'লে মনে কর। ঐ মূর্ত্তিটিই আমার চাই।"

* * * *

আর একদিক দিয়ে দেখলে বলতে হয়, ফ্রাইনের সঙ্গে সাধারণ বারাঙ্গনার কোনই তফাৎ ছিলনা। সত্যসত্যই তার শয্যা ছিল রাজ-

পথের মত—সেখানে যে কোন পথিক অনায়াসেই আনাগোনা করতে পারত। টাকা পেলে যার-তার আলিঙ্গনেই সে নির্ব্বিচারে আত্মদান করত।

একবার এক রূপোন্মাদের কাছে অনেক টাকা চাওয়াতে সে বললে, "সুন্দরী, অমুকের কাছ থেকে তো তুমি এর চেয়েও কম টাকা চেয়েছিলে।"

ফ্রাইন বললে, "তবে যতদিন না আমি তোমার প্রেমে পড়ি ততদিন অপেক্ষা কর, তাহ'লে তোমার কাছেও কম টাকা চাইব।"

এইভাবে দেহ বিক্রী ক'রে ফ্রাইন বিপুল বিত্তের অধিকারিণী হয়েছিল। আলেকজান্দর Thebes সহর ধ্বংস করেছিলেন। Thebesএর বাসিন্দাদের কাছে ফ্রাইন প্রস্তাব পাঠিয়েছিল, "আমি তোমাদের সমগ্র সহর নিজের টাকায় আবার নতুন ক'রে গ'ড়ে দিতে রাজি আছি এই সর্ত্তে, সহরের মাঝখানে একখানি শিলালিপিতে লিখে রাখতে হবে—'এই সহর ধ্বংস করেছিলেন আলেকজান্দর। কিন্তু পুনর্গঠন করেছে গণিকা ফ্রাইন'।

বলা বাহুল্য, Thebesএর বাসিন্দারা এ প্রস্তাবে সম্মত হয় নি।

*　　　*　　　*

ফ্রাইন একটা সত্যকথা জানত:—সৌন্দর্য্য বাস করে দেহের গোপনতার মধ্যেই। কারণ যা দেখা যায় না, বা অল্পই দেখা যায়, তাকেই ভালো ক'রে পাবার জন্যে মানুষের প্রাণের ক্ষুধা দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। সেইজন্যে নিজের দেহের নগ্নতা সে সহজে কারুর কাছে প্রকাশ করতে চাইত না। সেকালে গ্রীসের সাধারণ স্নানাগারে স্ত্রী-পুরুষ একত্রে নগ্ন

হয়ে স্নান করত। কিন্তু ফ্রাইনকে কোন দিন সাধারণ স্নানাগারে দেখা যায় নি। দেহকে ঢেকে রেখে সে রূপপিয়াসীর প্রাণের পিপাসা আরো বাড়িয়ে তুলত।

কিন্তু অবশেষে যে কারণে ফ্রাইনের দেহ গোপন রাখবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল, তা অত্যন্ত বিচিত্র। এবং এই ব্যাপারের ভিতর থেকে প্রাচীন গ্রীক জাতির মতিগতির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

একবার ফ্রাইনের কোন প্রেমিক খুব সম্ভব প্রত্যাখ্যাত হয়েই রাজদ্বারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে যে, সে হচ্ছে নাস্তিক। প্রাচীন গ্রীসে এটা ছিল যার-পর-নাই গুরুতর অভিযোগ এবং এজন্যে প্রাণদণ্ড হ'ত পর্য্যন্ত।

বন্দিনী ফ্রাইনকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হ'ল এবং তার পক্ষে উকিল হয়ে দাঁড়ালেন Hyperides নামে এক ভদ্রলোক। উকিল অনেক চেষ্টা করলেন, অনেক বক্তৃতা দিলেন—কিন্তু মামলা তবু ফ্রাইনের বিরুদ্ধেই গেল।

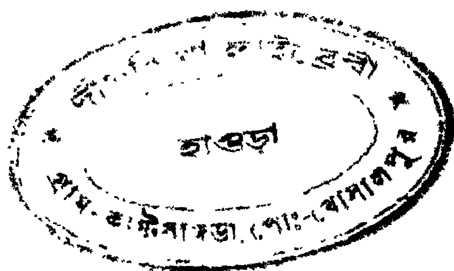
ফ্রাইনের প্রাণদণ্ড অনিবার্য্য দেখে উকিল তখন যে আশ্চর্য্য উপায় অবলম্বন করলেন, পৃথিবীর আর কোন আদালতে আর কখনো তা দেখা যায় নি। Hyperides আচম্বিতে এক টানে ফ্রাইনের বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফালা ফালা ক'রে ফেলে বিচারকদের সম্বোধন ক'রে বললেন, "দেখুন এর অপূর্ব্ব দেহ—স্বর্গেও যা দেখা যায় নি। এ দেহ যদি আপনারা ধ্বংস করতে চান, তাহলে সৌন্দর্য্যের দেবী ভেনাসের অভিশাপে আপনাদের সর্ব্বনাশ হবে।"

সেই পীবরস্তনী যুবতীর নিটোল ও নগ্ন বক্ষের সৌন্দর্য্য দেখে বিচারকরা বিস্ময়-প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। এবং অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে নয়নানন্দ উপভোগ ক'রে বললেন,—"এমন সুন্দর দেহ ধ্বংস করা

পাপ বটে। ফ্রাইনকে আমরা মুক্তি দিলুম। কিন্তু তার এমন অনুপম দেহ লুকিয়ে রাখবার বস্তু নয়। অতএব প্রতি বৎসরে নির্দিষ্ট এক উৎসবের দিনে এবার থেকে ফ্রাইনকে সর্ব্বসাধারণের সামনে নগ্ন দেহে দেখা দিতে হবে।"

আমাদের উর্ব্বশীর মত গ্রীকদের রূপলক্ষ্মী ভেনাসও পরিপূর্ণ যৌবন নিয়ে সমুদ্রগর্ভ থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। প্রতি বৎসরে একদিন ক'রে গ্রীসের সমুদ্রতীরে রাজ্যের সমস্ত লোক গিয়ে জড়ো হ'ত। এবং সেই দিনে ফ্রাইন উলঙ্গ দেহে ভেনাস-রূপে সাগরের ভিতর থেকে উঠে আসত—অমল নীলিমার ভিতর থেকে জীবন্ত ও নির্ম্মল একটি শ্বেত কমলের মতন। তার নিখুঁত নিটোল গৌর তনুর উপর থেকে সূর্য্যকিরণ মেখে জলবিন্দুগুলি পরম পুলকে ঝ'রে ঝ'রে পড়ত এবং অনুপম নগ্ন সৌন্দর্য্যের স্বর্গীয়তায় মুগ্ধ হয়ে সাগর-তটের বিপুল জনতা ঘন ঘন জয়ধ্বনি দিয়ে নিবেদন করত প্রাণের আনন্দ।

এই বিংশ শতাব্দীতে আমার ঘরে আজও ফ্রাইনের সেই শিলাময়ী নগ্নমূর্ত্তিই আমার চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যেন একটা মৌন সঙ্গীত! এবং যখনই তাকে দেখি আমার মন আজও জয়ধ্বনি না দিয়ে থাকতে পারে না।



এক রাতের মূল্য ত্রিশহাজার

প্রাচীন যুগ ছিল গণিকাদের স্বর্ণযুগ। ভারত, গ্রীস, বাবিলন, মিশর ও রোম—কয়েক শতাব্দীর যবনিকা তুলে যে কোন দেশের দিকেই দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, বারাঙ্গনাদের চঞ্চল যৌবনের অশ্রান্ত নৃত্য।

সেকালের কোন সভ্য দেশেই গণিকাদের পিছনে ঠেলে রাখা হ'ত না—কেবল অলস বিলাসীদের লীলা-নিকেতন নয়, সেকালে গণিকারা ছিল দেবমন্দির, রাজসভা এমন কি বিদ্বজ্জন-সমাজেরও সমুজ্জল অলঙ্কার! দেড় শতাব্দী আগেও আমাদের বাংলাদেশ গণিকাদের এই স্বর্ণযুগের জের টেনে এসেছিল—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত পুরাতন "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত স্বর্গীয় উমানাথ রায়ের (সুবিখ্যাত জগদীশনাথ রায়ের অগ্রজ) প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

মিশর ও য়ুরোপে চোখ ফেরালে দেখি, এক সময়ে গণিকারা ওখানকার রাণী ও সম্রাজ্ঞীর সিংহাসন থেকেও বঞ্চিত হ'ত না। এমন কি ইংলণ্ডে অধুনাপ্রসিদ্ধ বহু ডিউক, মার্কুইস ও আর্ল প্রভৃতির বংশ-তালিকা খুঁজলে দেখা যাবে, তাঁদের উৎপত্তির মূলে আছে গণিকারা! এবং য়ুরোপের একাধিক বিখ্যাত রাজা ও সম্রাট যে জারজ, ইতিহাস সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত দিতেও সঙ্কুচিত হয় নি!

তবে আজ এ সত্যটা সকলকেই মনে রাখতে হবে যে, সেকালকার গণিকাদের একমাত্র সম্বল ছিল না সুন্দর দেহ। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য্য ও নৃত্য প্রভৃতি নানা ললিত-কলায় অত্যন্ত দক্ষতা না থাকলে তখনকার গণিকারা উচ্চতর সমাজের অভিনন্দন লাভ করতে পারত না!

স্থানান্তরে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধে এ-বিষয় নিয়ে আমি বিশদ আলোচনা করেছি, অতএব এখানে পুনরুক্তির দরকার নেই।

কিন্তু কোন যুগেই অধিকাংশ গণিকারই শেষ-জীবন আনন্দজনক হ'ত না। আজ আমরা প্রাচীন গ্রীসের সাহিত্যে ও ইতিহাসে অমর গণিকা লাইসের একটি জীবনী-চিত্র প্রকাশ করছি, কারণ এরই মধ্যে বিশেষ ভাবে ফুটে উঠেছে, সাধারণ গণিকা-জীবনের আলো এবং ছায়া।

চতুর্থ শতাব্দীর কথা। লাইস্ ছিল সিসিলি দ্বীপের মেয়ে। বালিকা বয়সেই তার রূপের ছটা দেখে সেখান থেকে কারা তাকে বন্দী ক'রে গ্রীসের করিন্থ্ সহরে নিয়ে আসে। সে যুগে কোরিন্থ্ সহর ছিল সর্ব্বশ্রেণীর গণিকাদের জন্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ!

চিত্রকর আপেলেস একদিন পথ দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন, একটি কিশোরী ফোয়ারার সামনে দাঁড়িয়ে কলসে জল ভরছে। অপরূপ তার রূপমাধুরী, আশ্চর্য্য তার তনুর লীলা, মোহনীয় তার দেহের ভঙ্গিমা! সৌন্দর্য্যের উপাসক চিত্রকরের চোখ, তখনি দেখতে পেলে কিশোরীর আসন্ন যৌবনের স্বপ্ন! নাম তার লাইস্।

আপেলেস্ বালিকাকে নিমন্ত্রণ ক'রে নিজের বাড়ীতে এক ভোজ-সভায় নিয়ে এলেন।

বন্ধুরা হতাশ ভাবে বললে, "এ কি হে, এ কাকে নিয়ে এলে? এ যে একটা সামান্য বালিকা!"

আপেলেস্ মুখ টিপে হেসে বললেন "আমাকে তিন বছর সময় দাও। এই সামান্যই হয়ে উঠবে অসামান্য সৌন্দর্য্যের মধুর উৎস!"

চিত্রকরের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হ'ল না। লাইসের তনুতটে এসে চুম্বন করলে যেদিন তরুণ যৌবনের প্রথম জোয়ার, সেইদিনই তার দেহ হয়ে উঠল মূর্ত্ত সঙ্গীতের মত!

নতুন এক ফুল ফোটার খবর পেয়ে চারিদিক থেকে সাগ্রহে ছুটে এল সারা গ্রীসের রসিক ভ্রমররা! তপ্ত যৌবন-মধুবার দান পেয়ে ভক্তরা ভরিয়ে তুললে লাইসের বৃহৎ লৌহ-মঞ্জুষা! ভাস্কর গড়ে তার আদর্শে মর্ম্মর প্রতিমা, সাহিত্যিকরা রচনা করে তার প্রশস্তি, গায়করা গায় তার সৌন্দর্য্যের জয়গীতি! লাইসের নাম ফেরে পথে পথে লোকের মুখে মুখে।

পৃথিবীবিখ্যাত অমর বক্তা ডিমস্থেনেস, দার্শনিক ডায়োজেনেস ও আরিস্তিপ্পাস্ (যাঁর দার্শনিকতার মূলমন্ত্র হচ্ছে—'ভূত ভবিষ্যতের ভাবনা ভুলে বর্ত্তমানের আনন্দ উপভোগ কর') প্রভৃতির মতন বিদ্বান ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও লাইসের কোমল চরণ-কমলের তলায় হৃদয় পেতে কাটিয়ে দেন দিনের পর দিন!

আরিস্তিপ্পাসের এক ভৃত্য তাঁর কাছে এসে একদিন অভিযোগ করলে, "হুজুর, লাইসের জন্যে আপনি মুঠো মুঠো টাকা খরচ করেন, কিন্তু ডায়োজেনেস্ তার অনুগ্রহ পায় বিনামূল্যেই!"

আরিস্তিপ্পাস হেসে বললেন, "কি হয়েচে তা? লাইসকে আমি টাকা দি কেবল তাকেই উপভোগ করবার জন্যে, সেখানে অন্য লোকের আনাগোনা বন্ধ করবার জন্যে নয়!"

এমন কি ডায়োজেনেসেরও কাছে আরিস্তিপ্পাসের উদার ব্যবহার বড় বেশী বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হ'ল! তিনিও একদিন প্রতিবাদ করে বললেন, "দেখ আরিস্তিপ্পাস! একটা সাধারণ গণিকার সঙ্গে তোমার মতন লোকের এতটা ঘনিষ্ঠতা করা উচিত নয়!"

আরিস্তিপ্পাস্ বললেন, "যে বাড়ীতে অন্য লোক বাস করেছে সে বাড়ী ভাড়া নিতে কি তোমার লজ্জা হয়?"

—না।"

—"যে জাহাজে অন্য লোক চড়েছে সে জাহাজে চড়তে কি তোমার লজ্জা হয় ?"

—"না।"

—"তাহ'লে যে নারীকে আরো অনেকে উপভোগ করেছে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা করতে আমারই বা লজ্জা হবে কেন ?"

সেকালের এক দরিদ্র কবি লাইসের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে এই পংক্তিগুলি রচনা করেছিলেন :

"সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী লাইস্,
যখন আমি জিজ্ঞাসা করলুম—
এক রাত্রি তোমার সঙ্গে বাস করব,
আমাকে দিতে হবে কত মূল্য ?'
তুমি বললে—'ত্রিশ হাজার মুদ্রা !'
আমি ভাবলুম,
অধঃপতনের জন্যে এত বেশী টাকা খরচ করা অসম্ভব !"

* * *

দার্শনিক প্লেটো এবং এপিক্রেতেশ প্রভৃতি দেখিয়েছেন লাইসির শেষ জীবনের চিত্র !

যৌবন পালিয়ে গেছে জরার কবলে লাইসের দেহকে সমর্পণ ক'রে। পাছে জরার সঙ্গে চোখাচোখি দেখা হয়, সেই ভয়ে সে আর আরসিতে নিজের মুখ দেখতে সাহস করে না।

সারাদিন ব'সে ব'সে একলাই মদ খেয়ে প্রাণের জ্বালা ভোলবার

চেষ্টা করে এবং তার চারিপাশে ব'সে-দাঁড়িয়ে নেচে গেয়ে যারা উদ্দাম যৌবন-উৎসবে মত্ত হয়ে উঠেছে, তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে নীরবে করুণ নেত্রে!

আগে রূপ যৌবন ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে রাজা-মহারাজাকেও সে তুচ্ছ ক'রে উড়িয়ে দিত, কিন্তু আজ তার হাড়-কুৎসিত চেহারা দেখলে পথের মুটেও থুতু ফেলে মুখ ফিরিয়ে চ'লে যায়। আজ যে-কেউ তাকে দয়া ক'রে ডাকে, সে ভাগ্য মেনে তার কাছে ছুটে যায়। পাঁচ টাকা আজ তার কাছে অতুল ঐশ্বর্য্য! আজ সে পোষা কুকুরের মত, একটু অনুগ্রহ পেলেই কৃতার্থ!

ড্রুরি লেনের মিষ্টি নেল

"কমলা লেবু! কে আমার তাজা কমলা লেবু কিনবে?"

বিলাতের পুরাতন ড্রুরি-লেন থিয়েটারে এক পরমা সুন্দরী কিশোরী কমলা লেবু বিক্রী করত—তার নাম নেল।

গানের মতন মধুর গলার আওয়াজে সে যখন হাঁকত—"কমলা লেবু! কে আমার তাজা কমলা লেবু কিনবে?" তখন তার পানে তাকিয়ে প্রশংসায় ভ'রে উঠত সেকলেরই চোখ! লেবু কেনবার জন্যে সকলেই ব্যগ্রভাবে তার দিকে ঝুঁকে পড়ত এবং দেখতে দেখতে লেবুর ঝুড়ীর সঙ্গে সঙ্গে অনেকেরই হৃদয় খালি ক'রে নেল সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে যেত। সকলে আদর ক'রে বালিকাকে "মিষ্টি নেল" ব'লে ডাকত।

দ্বিতীয় চার্লস্ তখন ইংলণ্ডের সিংহাসনে। ক্রমওয়েলের লৌহ-শাসন থেকে মুক্ত হ'য়ে বিলাতে তখন আবার নূতন ক'রে রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং ব্যুমণ্ট ও ফ্লেচার, সার চার্লস সেড্‌লি ও ড্রাইডেন নব নব নাটক রচনা করছেন। ক্রমওয়েল অস্বাভাবিক ভাবে দেশকে সুনীতির ভক্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দ্বিতীয় চার্লসের সিংহাসন-প্রাপ্তির সঙ্গে-সঙ্গেই সুরু হ'ল তার প্রতিক্রিয়া। পথে পথে আবার জনতায় পরিপূর্ণ শুঁড়িখানা দেখা গেল, রাজা প্রকাশ্য ভাবে উপপত্নী নিয়ে বেড়াতে লাগলেন এবং সভাসদরা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও প্রকাশ্য ভাবে কুমারী, সধবা ও বিধবা —সকল শ্রেণীর রমণীর সঙ্গেই অবৈধ সম্বন্ধ স্থাপন করতে লজ্জিত হ'লেন না।

এই সময়েই নেল কমলা লেবু বিক্রী করত। তার পিতা কারাগারে, তার মা বারবনিতা ও বদ্ধ মাতাল। এমন বাপ-মায়ের মেয়ে নেল সেই

চরিত্রহীনতার যুগে যে সৎজীবন যাপন করবে তেমন আশা করা অন্যায়। কিন্তু তবু নেলের নাম বিলাতে আজও অমর হয়ে আছে এবং সকলেই ভালোবাসে তার স্মৃতিকে।

নেলের প্রথম দুই প্রেমপাত্র হচ্ছে চার্লস হার্ট ও জন লেসি নামে দুই অভিনেতা। তাদের তত্বাবধানে নেল অভিনয়ের প্রাথমিক শিক্ষালাভ ক'রে ড্রুরি-লেন থিয়েটারে যোগদান করলে।

অল্পদিনেই নেলের অভিনয়-খ্যাতি চারিদিকে প্রচারিত হয়ে পড়ল এবং তাকে দেখবার জন্যে রঙ্গালয়ে দলে দলে দর্শক সমাগম হ'তে লাগল। তারপর নেলের রূপ দেখে লর্ড বাকহার্ষ্ট তাকে উপপত্নীরূপে গ্রহণ করলেন। এইভাবে কিছুকাল গেল।

রঙ্গালয়ে নেল একদিন অভিনয় করছে এবং বহু সম্ভ্রান্ত দর্শকের মধ্যে ব'সে আছেন ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস; নেলকে দেখেই রাজা তাঁর হৃদয় হারিয়ে ফেললেন।

তার অল্পদিন পরেই শোনা গেল, ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস নেলকে তাঁর উপপত্নীর পদ প্রদান করেছেন। নেলের বয়স তখন সতেরো এবং চার্লসের আটত্রিশ।

নেলের পূর্ব্ব-প্রভু পাছে বাধা দেন, সেই ভয়ে চার্লস্ তাঁকে এক উচ্চপদ ও বাৎসরিক পনেরো হাজার টাকা বৃত্তি দিয়ে রাজকার্য্যের অছিলায় বিদেশে প্রেরণ করলেন।

কিন্তু চার্লস কেবল নেলকে নিয়েই তুষ্ট ছিলেন না—কারণ নেলের সঙ্গে তাঁর আরো দুই বিখ্যাত উপপত্নীর নাম শোনা যায়—ডাচেস অফ ক্লেভেল্যাণ্ড ও ডাচেস অফ পোর্টস্মাউথ। এঁরা দুইজনেই সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা।

রাজার উপপত্নী হয়েও নেল তার কথায় স্বাধীনতা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ

করেনি। মুখে যা আসত সে তাই বলত। তবু তার মধ্যে এতখানি মধুর রস থাকত যে, রাজা বা অন্য কেহই তা শুনে রাগ করতে পারতেন না।

রাজার দৌলতে নেলের সৌভাগ্যের আর সীমা ছিল না। প্রথম চার বৎসরের মধ্যেই সে নিজের হাত-খরচ নিয়ে ব্যয় ক'রেছিল নয় লক্ষ টাকা। তার ঘরের একখানি খাটেরই দাম ছিল ষোল হাজার টাকারও বেশী।

নেল ও তার সন্তানদের জন্যে চার্লস্ বাৎসরিক পঁচাত্তর হাজার টাকার বৃত্তি ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছিলেন।

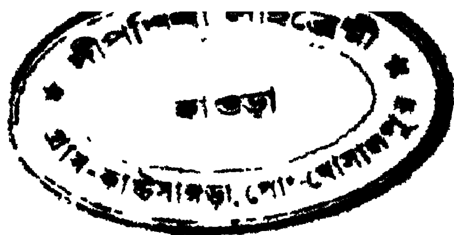
১৬৭০ খৃষ্টাব্দে চার্লসের ঔরসে ও নেলের গর্ভে একটি পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল। খোকার মুখ দেখে রাজা এত খুসি হলেন যে, নেলকে রাজ-সংসারে রাণীর মহলে একটি মহা-সম্মানের পদ প্রদান করলেন। পুত্রের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করতেও রাজা ভুললেন না। পরে এই জারজ পুত্রই রাজ-পিতার অনুগ্রহে ডিউক অফ সেণ্ট আলবান্স নামে সুপরিচিত হয় এবং তার বিবাহ হয় মহা-সম্ভ্রান্তবংশীয় আর্ল অফ অক্সফোর্ডের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণীর একমাত্র কন্যার সঙ্গে। জারজের ভাগ্যে এই কল্পনাতীত সৌভাগ্য য়ুরোপেই সম্ভবপর।

রাজার অন্য যে দুইজন ডাচেস উপাধিধারিণী উপপত্নী ছিলেন, সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র মহিলা হ'লেও তাঁরা রাজার বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। তাঁরা প্রকাশ্যভাবেই রাজা ছাড়া আরো অনেকেরই উপরে অনুগ্রহ বৃষ্টি করতেন।

কিন্তু বারবনিতার কন্যা ও নিজেও বারবনিতা হ'লেও রাজার অনুগ্রহ লাভ করবার পর নেল কোনদিন আর দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকটে দেহ বিক্রী করেনি—এদিকে তার "সতীত্ব" ছিল অসাধারণ! রাজা তা জানতেন এবং বলতেন যে "আশ্চর্য্য! আমার বিশ্বাস, নেলি আমাকে সত্যিই ভালোবাসে!"

চার্লস যখন নেলকে "কাউণ্টেস অফ গ্রীণউইচ" উপাধি দানের ব্যবস্থা করছিলেন, সেই সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পরে যিনি রাজা হবেন সেই ভ্রাতাকে চার্লস মৃত্যুশয্যায় ব'লে যান, "দেখো, নেলী-বেচারী যেন উপোস ক'রে মারা না যায়।" তাঁর ভ্রাতা—পরে দ্বিতীয় জেম্‌স্—রাজার এ আদেশ পালন ক'রেছিলেন।

চার্লসের মৃত্যুর পর নেল আর বেশীদিন বাঁচেনি। দু'হাতে সারা-জীবন খরচ ক'রেও মৃত্যুকালে সে পনেরো লক্ষ টাকার সম্পত্তি রেখে গিয়েছিল।



ডোরোথি জর্ডনের কাহিনী

ডোরোথি জর্ডনের নাম এদেশে পরিচিত নয়। কিন্তু এক যুগে সে ছিল বিলাতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসের অভিনেত্রী। তার যশ ও সৌভাগ্য দেখে বিলাতের অমর অভিনেত্রী মিসেস সিডন্স পর্য্যন্ত হিংসা প্রকাশ করতেন।

গরিবের মেয়ে ডোরোথির অর্থ, রূপ ও যশের কিছুই অভাব ছিল না। কিন্তু তার শেষ-জীবন হয়ে উঠেছিল অশ্রুজলে করুণ।

তার বাপ-মা অভিনয় করতেন। ডোরোথি ও ডাবলিন সহরে প্রথম রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়।

সে-রঙ্গালয়ের কর্ত্তা ছিল রিচার্ড ডালি। ডোরোথির রূপ দেখে তার এমন মাথা ঘুরে যায় যে শেষটা সে জোর ক'রে তার সর্ব্বনাশ করে। অবিলম্বে তার সন্তান-সম্ভাবনা হ'ল। নারী-জীবনের চরম অপমান এবং ডালির কবল থেকে মুক্ত হবার জন্যে ডোরোথি দেশ ছেড়ে ইংলণ্ডে পালিয়ে গেল।

দেখতে দেখতে লণ্ডন সহরে তার অভিনয়-চাতুর্য্যের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। তার অসীম রূপ-যৌবনের লোভে অগুন্তি প্রেমিকেরও অভাব হ'ল না। ডোরোথি কিন্তু অটল রইল।

এই সময় রিচার্ড ফোর্ড নামে এক ব্যারিষ্টারের সঙ্গে ডোরোথির পরিচয় হ'ল। বিবাহ ও গার্হস্থ্য জীবনের লোভ দেখিয়ে ডোরোথির হৃদয়ে সে একটি স্থায়ী আসন দখল করলে; ডোরোথিও তাকে স্বামীর

মতই ভালোবাসত এবং তার মাহিনা থেকেই ফোর্ড পরম আরামে জীবন যাপন করতে লাগল। ফোর্ড কিন্তু ডোরোথিকে বিবাহ করলে না।

ডিউক অব ক্লারেন্স (পরে ইংলণ্ডের রাজা) ডোরোথির প্রেমে পড়লেন। অনেক দিন চেষ্টা এবং অনেক কাকুতি-মিনতির পর ডোরোথি আর যুবরাজকে উপেক্ষা করতে পারলে না। তখন ছুটে গেছে তার বিবাহের স্বপ্ন। সে যুবরাজের উপপত্নী হ'ল।

রাজার কাণে এ-কথা উঠল। যুবরাজকে ডেকে তিনি বললেন "এ সব কি; এ সব কি? তুমি নাকি একটা নটীকে বাঁধা রেখেছ?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ!"

—"বটে! তাকে কত টাকা ক'রে দাও শুনি?"

—"বছরে পনেরো হাজার টাকা!"

—"পনেরো হাজার? বড় বেশী, বড় বেশী! সাড়ে সাত হাজার করে দিও!"

যুবরাজের চরিত্রহীনতার জন্যে রাজা কিছুমাত্র রাগ প্রকাশ করলেন না, কেবল উপপত্নীর মাহিনা কমাতে বললেন! গত শতাব্দীতে ইংলণ্ডের নীতি-জ্ঞান ছিল এমনি ধারাই!

যুবরাজ ডোরোথিকে বৎসরে পনেরো হাজার টাকা দেবার অঙ্গীকার করেছিলেন বটে, কিন্তু সে হচ্ছেঅঙ্গীকার মাত্র! কারণ যুবরাজের নিজের খরচ এত বেশী ছিল যে, টাকা দেওয়া দূরে থাক, ডোরোথি রঙ্গালয় থেকে, যা-কিছু রোজগার করত যুবরাজ তার সমস্তই গ্রহণ করতেন নিজের হাতে।

এই ব্যাপার নিয়ে লোকের মুখে মুখে অনেক-রকম ছড়া চলত। একটি ছড়ার নমুনা:—

"As Jordan's high and mighty squire
Her playhouse profits deigns to skim,
Some folk uda a ciously enquire,
Does he keep her or she keep him ?

ডোরোথি এমন মনপ্রাণ দিয়ে যুবরাজকে গ্রহণ করেছিল যে, আপনার কষ্টার্জ্জিত সমস্ত অর্থ তাঁর হাতে তুলে দিতে কিছুমাত্র ইতঃস্তত: করত না। দীর্ঘ বিশ বৎসর কাল সে যুবরাজের সঙ্গিনী ছিল। এর মধ্যে একদিনের জন্যেও সে অবিশ্বাসিনী হয় নি। তার জীবন ছিল বিবাহিত জীবনের মতই পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক। তার চরিত্রের প্রভাবে যুবরাজের বিশৃঙ্খল জীবনও সংযত হয়ে উঠেছিল—এমন-কি যুবরাজ পার্লামেণ্টে যে সব বক্তৃতা দিতেন তার ভিতরেও থাকত ডোরোথির হাত ও শিক্ষিত মনের প্রভাব! যুবরাজের পারিবারিক উৎসবাদিতেও ডোরোথি গৃহস্বামিনীর পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ইংলণ্ডের সর্ব্বোচ্চ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে অভ্যর্থনা করত। সুতরাং ডোরোথিকে যাঁরা সাধারণ পণ্যাঙ্গনা ব'লে মনে করবেন, তাঁরা ভুল করবেন।

কিন্তু এমন একদিন এল যুবরাজ যেদিন বলতে লজ্জিত হলেন না—'আজ থেকে আর আমাদের দেখা হবে না।'

উত্তরে ডোরোথি যুবরাজকে একটিও কটুকথা বললে না।

বুকের ভিতরে জ্বলন্ত চিতা নিয়ে ডোরোথি একান্তভাবে নাট্য-সাধনায় নিযুক্ত হ'ল। কিন্তু এত-বড় দুর্ভাগ্যের আঘাতে যার মন থেকে সমস্ত আশা-আনন্দের আলো নিবে গেছে, সে কি আর অপরকে আনন্দ দিতে পারে ? অভিনয় আর তেমন জম্‌ল না।

জীবনে কোনদিন সে টাকা জমাতে পারে নি, টাকার পূজা করে নি। কাজেই এখন তার অর্থকষ্টের আর সীমা রইল না।

যুবরাজের ঔরসে ডোরোথির হয়েছিল ছেলে-মেয়ে দশটি। তারা

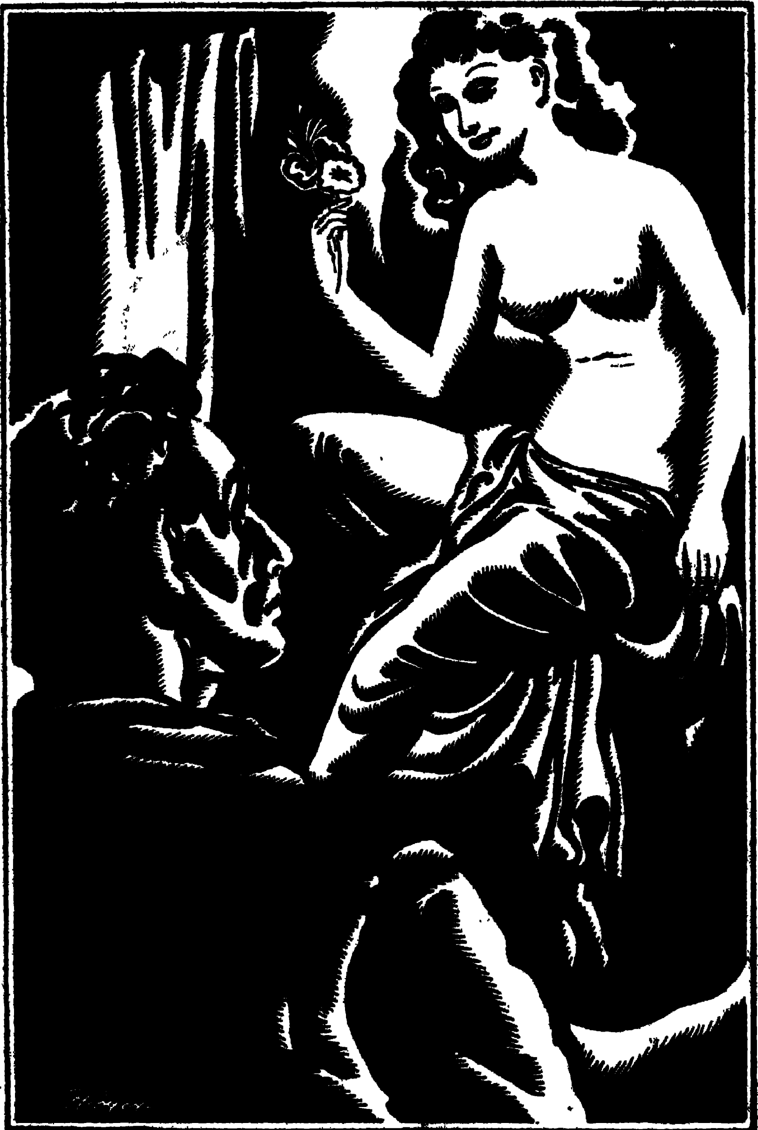
অধিকাংশই বড় বড় বংশে বিবাহিত হয়েছিল। এক মেয়ের বিয়ে হয়, আর্ল ফক্‌ল্যাণ্ডের সঙ্গে। আর দুই মেয়েও আর্ল ও লর্ডের ঘরণী হয়। তার এক ছেলে আর্ল অব্ মনষ্টার নামে বিখ্যাত।

অর্থকষ্টে প'ড়ে ডোরোথি শেষটা যুবরাজের কাছে সাহায্য ভিক্ষা চাইলে। উত্তর কি পেলে জানি না; কিন্তু প্রকাশ যে, পাছে ডোরোথি তাঁকে বিরক্ত করে সেই ভয়ে যুবরাজ ভয় দেখিয়ে তাকে ফ্রান্সে নির্ব্বাসিত করেন!

সেইখানেই এক বৎসর মধ্যে (১৮১৬ অব্দে) পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে অভাগিনী ডোরোথির মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে সে ভিখারিণীর মতন দারিদ্র্যের যাতনা ভোগ করেছিল। তার উপাধিধারী ছেলে-মেয়েরা টাকার কাঁড়ির উপরে ব'সেও মায়ের পানে ফিরে তাকায় নি!

পরে ডোরোথির প্রপৌত্র ডিউক অব ফাইফের সঙ্গে রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর প্রপৌত্রী রাজকুমারী রয়েলের (রাজা জর্জ্জের সহোদরা) বিবাহ দেন। অদৃষ্টের পরিহাস!

বেচারী ডোরোথির একমাত্র দোষ এই যে, সে বিশ্বাস করেছিল পুরুষের হৃদয়কে।



বিজয়িনী বোনাপার্ট

বিজয়িনী 'বোনাপার্ট' !

(ঐতিহাসিক রূপকাহিনী)

ফরাসী-বিপ্লবের পর ওদেশে দিগ্বিজয়ের জন্যে অতুলনীয় হয়েছিলেন দুজন লোক—তাঁরা হচ্ছেন পুরুষ ও নারী, ভ্রাতা ও ভগ্নী, নেপোলিয়ন ও পলিন।

ভাই করতেন মানুষের দেশজয়, বোন করতেন মানুষের হৃদয়-জয়। ভাই ব্যবহার করতেন বন্দুক আর কামান এবং বোন ব্যবহার করতেন পৃথিবীর সব-চেয়ে প্রাচীন অস্ত্র—অর্থাৎ ভুরুর ধনুক আর নয়ন-বাণ।

পলিন বোনাপার্টের দুই বিবাহ। প্রথম স্বামীর নাম জেনারেল লেক্‌লার্ক এবং দ্বিতীয়ের নাম প্রিন্স্ বোর্ঘিস্। কিন্তু এখানে স্বামীদের নাম তোলা মিথ্যা, কারণ তাঁদের আবির্ভাব হয়েছিল কেবল রূপসী পলিনের জীবন-কবিতার পাদপূরণের জন্যে।

পলিনের কথা আলোচনা করলেই মনে প্রশ্ন জাগে—মহিলায় ও গণিকায় তফাৎ কোথায়? দশজনকে অবৈধভাবে দেহদান করলেই যদি গণিকা হয় তাহ'লে বলতে পারি, পলিন দেহদান করেছে অসংখ্য ব্যক্তিকে এবং সমাজের চোখের সামনেই। কিন্তু পলিনকে কেউ গণিকা বলতে সাহস করে না।

কেন? দুর্দ্ধর্ষ সম্রাট নেপোলিয়নের সহোদরা এবং 'প্রিন্সেস' ও 'ডাচেস' উপাধিধারিণী ব'লেই কি পলিন সমাজের কাছে ছাড়পত্র পেয়েছে? কিন্তু আঠারো ও উনিশ শতকের য়ুরোপে এমন হাজার হাজার সাধারণ নারী ছিলেন, যাঁরা কেবল যাকে-তাকে দেহদানই করতেন না—দেহ দিয়ে টাকাও নিতেন, কিন্তু তবু তাঁরা গণিকা নামে গণ্যা নন,

ওদেশে আজও তাঁরা 'মহিলা'। বিলাতের মহা-সম্ভ্রান্ত ও বিখ্যাত স্যার রিচার্ড ওর্স্‌লির স্ত্রী চৌত্রিশবার বিভিন্ন পরপুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হবার পরে তাঁর স্বামী আর সইতে না পেরে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন! তবুও তিনি গণিকা নন!

অবশ্য এজন্যে প্রাচ্যের মাথাব্যথার কারণ নেই। প্রতীচ্যের সমাজ-পতিরা দূরবীণের উল্টোদিক দিয়েই পৃথিবীকে দেখবার চেষ্টা করেন। ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন ছিলেন জারজ সন্তান। ইংলণ্ডের জনসাধারণও এক সময়ে এক গণিকা-পুত্রকে রাজসিংহাসনে বসাবার জন্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত করেছিল। ইংলণ্ডের বহু ডিউক, মার্কুইস, আর্ল্‌ ও ব্যারন প্রভৃতি উপাধিভূষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের উৎপত্তি হয়েছে গণিকা-পুত্র বা অবৈধ সন্তানেরই দ্বারা। ইংলণ্ডের রাজবংশের সঙ্গেও তাঁদের অনেকে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। প্রাচ্য-সমাজবিধি প্রতীচ্যে অচল। যদিও মিস্‌ মেয়োর দল এবং বিলাতী 'প্রপাগাণ্ডা' এ-সব স্বদেশী সত্যকথা ভুলেও স্মরণে আনে না।

এখন নীতির কথা রেখে পলিনের কথা বলি। সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ছিলেন তিন বোন—এলাইস্‌, পলিন ও ক্যারোলিন। চরিত্রে তিনজনেই ছিলেন বিচিত্র, অবৈধ ভাবে নিজের হৃদয় বিলিয়ে দিতে এবং পরের চিত্ত হরণ করতে তিনজনেই ছিলেন অতি-পটু। পুরুষজাতির পক্ষে তাঁরা বিপদজনক ছিলেন, কারণ তাঁরা তিনজনেই রূপসী।

তিন বোনের ভিতরে আবার পলিন ছিলেন রূপে, লীলায়, চাপল্যে, বেহায়াপনায় ও নীতিহীনতায় অগ্রগণ্য। পলিনের রূপ এখন ইতিহাস-বিখ্যাত হয়েছে। নেপোলিয়নের রাজত্বকালে রাজধানী পারি-নগরীতে পলিনের চেয়ে সুন্দরী আর ছিল না—তাঁর মধু তনু ছিল শিল্পীর আরাধ্য।

সে-যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর ক্যানোভা পলিনের অর্দ্ধনগ্ন তনুকে রূপলক্ষ্মী ভেনাস রূপে অমর ক'রে রেখেছেন। আধুনিক যুগে তেমন দেহ দেখা যায় না। নেপোলিয়ন নিজে বলতেন—পলিনের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত প্রাচীন রোমের আদর্শ-সৌন্দর্য্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এক নারী অন্য নারীর রূপকে সহজে স্বীকার করে না। কিন্তু বহু নারী পলিনের সৌন্দর্য্য-কাহিনী বর্ণন করেছেন উচ্ছ্বসিত ভাষায়—এমন কি পলিনের বিরুদ্ধবাদিনীরাও। তাঁর এক শত্রু—অর্জ্জেন্ দুক্রেষ্ট্ বলছেন: "পলিনের চেয়ে রূপসী মেয়ে জীবনে আমি দেখিনি। কারুর সাধ্য নেই, তাঁর দেহের ভিতর থেকে এতটুকু খুৎ বার করে।" কাউন্টেস্ পোতোস্কা বলছেন: "পলিনের সৌন্দর্য্য গ্রীক ভাস্কর্য্যের আদর্শ নারীমূর্ত্তির মত। নিজের সৌন্দর্য্যকে তাড়াতাড়ি নষ্ট করবার জন্যে দেহের উপরে সে যথেষ্ট অত্যাচারই করেছে, তবু যৌবন-সীমা অতিক্রম করবার পরেও সমবয়সী যে-কোন সুন্দরীকে সে পরিম্লান ক'রে দিতে পারত।"

তার দেহখানি ছিল বালিকার মত খুব ছোট্ট। যেমন তার তুলির টানে লেখা নাক-মুখ-চোখ, তেমনি তার পূরন্ত গড়ন-পিটন! সব-চেয়ে লোভনীয় ছিল তার নিটোল বুক—অতি-ফিন্‌ফিনে রেশ্‌মী আবরণ ভেদ ক'রে যা স্বপ্নকমলের মত ফুটে উঠে চোখে আনত কবিতার গোলাপী আবেশ! নিজের পীবর স্তনকে সে সর্ব্বদাই যতটা-সম্ভব আদুড় ক'রে সকলকেই দেখাতে ভালোবাসত। এজন্যে পলিনের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযোগ করা চলে না। কারণ বিপ্লবের পর "Directory"র যুগে ফরাসী-যুবতীদের মধ্যে চল্‌তি রীতি হয়েছিল, বুকের স্তন অনাবৃত রাখা। আঠারো শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রূপসীরা বুকের উপরে স্বাভাবিক -রঙে-রঙীন মোমে-গড়া কৃত্রিম স্তন ধারণ করতেন, কিন্তু ফরাসী-রঙ্গিনীরা নকলকে বাতিল ক'রে দেখাতে চাইতেন আসলকেই!

নব যৌবনের কুঞ্জবনে

গ্রীক-পুরাণের দেবতাদের মধ্যে একবার সৌন্দর্য্যের প্রতিযোগিতা হয়েছিল—পরীক্ষক ছিলেন পারিস, পুরস্কার ছিল একটি সোনার আপেল। অদ্বিতীয়া সুন্দরীরূপে দেবী ভেনাস সেই আপেল হস্তগত করেন।

ভাস্কর ক্যানোভার সাধ হ'ল, পলিনের দেহ পরীক্ষা করবেন। পলিনের আপত্তি হ'ল না। দেহের সমস্ত পোষাক ফেলে দিয়ে আধুনিক ভেনাস পলিন উলঙ্গ হয়ে দেখা দিলে ভাস্করের ক্ষুধিত দৃষ্টির সামনে! নগ্না সম্রাট-ভগিনী! পরিতৃপ্ত ক্যানোভা পলিনের হাতে একটি সোনার আপেল উপহার দিয়ে স্বীকার করলেন—হ্যাঁ, এ রূপের তুলনা নেই বটে!

পলিনের জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল দেহের সাধনা। তার অন্য দুই বোন ছিল রাণী হয়ে মুকুট পরবার জন্যে লালায়িত। কিন্তু পলিন বলত, "মুকুটে আমার রুচি নেই। ইচ্ছে করলেই আমি মুকুট পরতে পারি। কিন্তু আমার ও-উপসর্গে দরকার কি, মুকুট নিয়ে কাড়াকাড়ি করুক্ আমার আত্মীয়রাই।"

আমাদের উর্বশী ও গ্রীকদের ভেনাস নাকি পূর্ণযৌবন নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মানবী পলিনের জীবনে প্রথমেই শৈশব এসেছিল বটে, কিন্তু চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সেই সে পরিপূর্ণ যৌবনকে লাভ করেছিল, শীতপ্রধান ফ্রান্সে যা সাধারণ নয়। এবং সেই বয়সেই পলিন পাড়ার ছোঁড়াদের মাথা এমন ঘুরিয়ে দিতে সুরু করলে যে, বুদ্ধিমতী মা লেটিজিয়া বোনাপার্ট তাঁর ছটফটে ফাজিল মেয়েটির জন্যে তাড়াতাড়ি বর সংগ্রহ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সতেরো বছর বয়সেই পলিন জেনারেল লেক্লার্কের বউ হ'ল বটে, কিন্তু তার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হ'ল না একটুও। সে দু'চোখো প্রেম সুরু করলে, যাকে দেখে তাকেই দয়া করে!

তারপর পলিন তার জাদ্রেল-স্বামীর সঙ্গে সম্রাট-ভ্রাতার আদেশে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু কিছুদিন পরেই বিধবা হয়ে দেশে ফিরে আসে। তারপর ইতালীর খুব বড়-ঘরের ছেলে ও মস্ত ধনী প্রিন্স ক্যামিলো বোর্ঘিসের সঙ্গে হ'ল পলিনের দ্বিতীয় বিয়ে। সে কেবল 'প্রিন্সেস' হ'ল না, নেপোলিয়নের দয়ায় একটি ছোট-খাটো রাজ্য ও 'ডাচেস' উপাধিও পেলে—কিন্তু কয়লার ময়লা যাবার নয়, পলিন অপরিবর্ত্তনীয়! প্রেম-সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে সে আগেকার মতই ভাসতে লাগল, তার দ্বিতীয় স্বামীর হয় বাধা দেবার শক্তি, নয় বাধা দেবার ইচ্ছা ছিল না; কারণ তাঁর জীবনের প্রধান কাম্য ছিল মাত্র দুটি—প্রচুর খাদ্য ও প্রচুর নিদ্রা! এই দুটি পেলেই আর কোনদিকে তিনি ফিরে চাইতেন না। পলিন বা তার স্বামী প্রাপ্ত রাজ্য শাসন করবার জন্যে কোন উৎসাহই প্রকাশ করলে না—ডাচেস ব্যস্ত নিজের দেহ ও পরকীয় প্রেম নিয়ে এবং প্রিন্স ব্যস্ত উদরপূজা ও ঘুম নিয়ে! ব্যাপার দেখে নেপোলিয়ন দান-করা রাজ্য আবার ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হ'লেন—যদিও পলিনের 'ডাচেস' উপাধি ও আয় বজায় রইল!

রাজ্যের রসিক-রুষরা দেখলে, পলিন তার স্বামীর জন্যে একটুও মাথা ঘামায় না, সে অসীমসুন্দরী এবং তার প্রেমে কোন বাছবিচার নেই, নিত্য-নূতন পুরুষ পেলেই সে খুসি! তখন তারা ধরায় অবতীর্ণ স্বর্গের দেবীর মত পলিনকে মাথায় ক'রে নাচতে লাগল, তার সৌন্দর্য্যের বিজয়-সঙ্গীতে সমগ্র ফ্রান্স ধ্বনিত হয়ে উঠল, অন্যান্য প্রত্যেক সুন্দরী প্রেমিকার খ্যাতি তার কাছে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ল। প্রেম-পাগ্লী পলিনের আনন্দের আর সীমা নেই, সে তো এইই চায়! নানা শিল্পী, নানা সৈনিক-যুবক সর্ব্বদাই তার দ্বারস্থ এবং তাদের জন্যে পলিনের হৃদয়-দ্বারও সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। প্রকাশ্য ভাবেই মনের মত পুরুষকে নিয়ে সে নিজের প্রাসাদ

দিবারাত্র উৎসবময় ক'রে তুললে—তার শয়নগৃহে কেবল একমাত্র ব্যক্তির প্রবেশ নিষিদ্ধ হ'ল, তিনি হচ্ছেন তার স্বামী প্রিন্স বোর্ঘিস্। কেবল শয়নগৃহ নয়, অনেক সময়ে যে-দেশে সে আসর বসাতো, পলিন তার স্বামীকে সে-দেশের ত্রিসীমানা মাড়াতে দিত না!

নেপোলিয়নের চার ভ্রাতাই তাঁর কৃপায় দেশ ও জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করেছিলেন। নিজের পরিবারে নেপোলিয়ন ছিলেন দোহনীয় কামধেনুর মত। কিন্তু সেজন্যে তাঁরা কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন নি, শেষ পর্য্যন্ত একমাত্র জোসেফ ছাড়া তাঁর কোন ভাইই তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন নি। নোপোলিয়ন নিজের দুই বোনকে সিংহাসনের অধিকারিণী ক'রে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদেরও কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন বিশ্বাসঘাতকতা, এমন-কি ক্যারোলিন তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্যে শত্রুদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করতেও ছাড়েনি। ভাইকে ভালোবাসত কেবল পলিনই। শুধু নেপোলিয়নকে কেন সব ভাইকেই। এবং সে ভালোবাসা এত গভীর ও অসাধারণ যে, নিন্দকের তীব্র চক্ষু সেই নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃপ্রেমের প্রতিও জঘন্য কটাক্ষপাত করতে সঙ্কুচিত হয়নি।

কিন্তু তার উন্মত্ত প্রেমব্যাধির কথা ছেড়ে দিলে দেখিতে পাই, পলিনের স্বভাব ছিল সত্যই মধুর। এ সম্বন্ধে বহু প্রমাণেরও অভাব নেই। ১৮১৫ অব্দে নেপোলিয়ন যখন সাম্রাজ্য হারিয়ে ক্ষুদ্র এল্‌বা দ্বীপে নির্ব্বাসিত, তখন রাজ্যহারা সম্রাটের পাশে অন্য কোন ভাই-বোনকে দেখতে পাইনা. কেবল দেখি পলিন নিজের প্রজাপতি-জীবন ত্যাগ ক'রে দাদার পাশে গিয়ে তাঁর নির্ব্বাসন-দণ্ডকে যথাসম্ভব সহনীয় ক'রে তোলবার চেষ্টা করছে। এই করুণা হচ্ছে পলিনের সব চেয়ে উজ্জ্বল গুণ।

পলিনের শিক্ষা, জ্ঞান বা বুদ্ধি ছিল না বললেই চলে। কিন্তু রূপই ছিল তার শ্রেষ্ঠ শক্তি—"সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র"। বৈঠকী আলাপের সময় সে এমন হাস্যমধুর উত্তর দিতে পারত যে, সকলেই তাকে বিশেষ বুদ্ধিমতী ব'লে মনে করত।

বিলাসিতা ও সাজ-সজ্জাতেও পলিন ছিল অসম্ভবরূপে মুক্তহস্ত। দ্বিতীয়বার বিবাহের সময় পলিন প্রিন্স বোর্ঘিসের কাছ থেকে নগদ সাড়ে চার লাখ টাকা ও সাত লাখ টাকার জড়োয়া গয়না যৌতুক পেয়েছিল। সমস্ত জড়িয়ে তার গহনার ভাণ্ডারে ছিল দেড় কোটি টাকার হীরা, পান্না, মরকত ও মুক্তা প্রভৃতি রত্ন। তার পোষাকের সংখ্যা ছিল ছয় শতেরও বেশী, সে-সবেরও দাম হবে কয়েক লক্ষ টাকা। তার অন্যান্য প্রসাধন-সামগ্রীরও দাম দিয়ে একটি রাজ্য কেনা চলত। তার গাড়ীর সার, ঘোড়ার সার এবং দামী পোষাক-পরা সহিস-কোচম্যান ও দাস-দাসীর সার দেখে সারা রাজধানী বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যেত। সে যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় আনাগোনা করত, তখন তার সাজ-পোষাক প্রভৃতি বহন করবার জন্যে সাত-আটখানা মালগাড়ীর দরকার হ'ত।

স্বামীর বিপুল আয়েও তার কুলাতো না, দাদার কাছ থেকেও সে লক্ষ লক্ষ টাকা মাসোহারা পেত, তার পক্ষে তাও যথেষ্ট ছিল না। নেপোলিয়ন তাঁর "আত্মচরিতে" বলেছেন, "পলিন অত্যন্ত অমিতব্যয়ী। সে নিজেকে একেবারে বিলিয়ে দেয়। আমি তাকে এত সম্পত্তি দিয়েছি যে, তার অত্যন্ত ধনী হওয়াই উচিত। কিন্তু সে যতবার যা পেয়েছে, দু-হাতে উড়িয়ে দিয়েছে। মা তাই তাকে বকতেন ও বলতেন যে,—"তুই গরিব-খানায় গিয়ে মরবি।"

আঠারো শতাব্দীর ফরাসী রতির দল যতই সুন্দরী ও পোষাকী বিবি হোন, তাঁদের দেহের আবৃত অংশ ছিল আমাদের পক্ষে অসম্ভব নোংরা!

কারণ তাঁদের কেউ কেউ স্নান করতেন ন-মাসে ছ-মাসে এবং অনেকেই সারা-জীবনেও স্নানের নাম মুখে আনতেন না। তাঁদের দেহের দুর্গন্ধ দূর করবার পক্ষে সুগন্ধ দ্রব্যই যথেষ্ট ব'লে বিবেচিত হ'ত। এ জঘন্য রীতির পরিবর্তন হয় নেপোলিয়নের যুগেই। পলিন এমন নোংরা ছিল না, প্রতিদিন স্নান ক'রে সে দেহকে পরিষ্কার রাখত। এবং তার স্নানেও নূতনত্বের অভাব ছিল না। প্রাচীন রোমের বিলাসিনী পপ্পিয়া দুধে স্নান করত। রূপ-শিল্পী পলিনও নিজের জ্যোৎস্নার মত মাজা ও তাজা রং অমলিন রাখবার জন্যে প্রত্যহ প্রথমে গরম ও পরে ঠাণ্ডা দুধে ভরা চৌবাচ্চায় শরীর ডুবিয়ে ফুটে থাকত দুধ-সায়রে জীবন্ত স্বপ্ন-পারিজাতের মত। একজন কাফ্রী চাকর তার রঙিন মোমের পুতুলের মত ছোট্ট নগ্ন দেহ দুইহাতে ক'রে তুলে চৌবাচ্চায় চুবিয়ে দিত। সম্রাট-ভ্রাতা তাঁর ভগ্নীর এই-সব যথেচ্ছচারিতা সমর্থন করতেন না, তিনি যখন বিরক্ত হয়ে ব'লে পাঠালেন, তার মতন তরুণীর পক্ষে এ-ভাবে পুরুষমানুষের কোলে ওঠা উচিত নয়, পলিন তখন অতি সরলার মতন দুটি ডাগর আঁখি বিস্ফারিত ক'রে বলে উঠল, "হা ভগবান! কাফ্রীও আবার পুরুষমানুষ নাকি!"

ভাস্কর ক্যানোভার ভেনাস-মূর্ত্তির আদর্শরূপে পলিন কয়েকদিন দেহের উপরার্দ্ধ নগ্ন ক'রে ব'সে থেকেছিল ব'লে রাজ্যময় আন্দোলন হয়েছিল, কিন্তু সে তা গ্রাহ্যের মধ্যেও গণ্য করেনি। একজন প্রশ্ন করেছিল, "বুক-পেট আদুড় ক'রে ব'সে থাকতে তোমার অস্বস্তি হয়নি?" এখানে 'অস্বস্তি' শব্দে 'নারীসুলভ লজ্জা'ই বোঝাচ্ছে, যে বালাই পলিনের ছিল না। কাজেই তার মাথায় আসল অর্থ ঢুকল না, সে সহজ ভাবেই বললে, "ওমা, অস্বস্তি হবে কেন? ঘরের ভিতরে আগুনের আংরা ছিল যে!"

নগ্ন হ'তে পলিনের একটুও বাধত না। সারাদিনের অধিকাংশই কেটে যেত তার দেহচর্চ্চায় এবং প্রায়ই সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে দাসীদের সামনে—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কেবলমাত্র "সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ" প'রে বিবস্ত্রা হয়ে বেড়িয়ে বেড়াত। সে যখন স্নান-ঘরে থাকত, পুরুষ-অতিথিরা এসে সেইখানেই তাদের সঙ্গে দেখা ও আলাপ করত। কবির ভাষায় তাকে অনুরোধ করতে হ'ত না—"ফেল গো বসন ফেল, ঘুচাও অঞ্চল," বিবসনা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়ে লোক-চক্ষুকে চকিত ও মোহিত করবার জন্যেই তার আগ্রহ ছিল বেশী !

পলিন আর এক ফ্যাসানের প্রবর্ত্তন করেছিল। ভোরবেলায় পুরুষ-বন্ধুরাও তার সাক্ষাৎপ্রার্থী হ'লে সে শয়ন-গৃহকেই বৈঠকখানায় পরিণত ক'রে এবং শয্যা থেকে গাত্রোত্থান না ক'রেই সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইত—লীলায়িত ভঙ্গিতে কোমল উপাধানে ঠেসান দিয়ে। তার দেখাদেখি তখনকার আরো অনেক বিলাসিনী শয্যা-বৈঠকের আয়োজন ক'রে এটাকে প্রথায় পরিণত করলেন।

পলিনের প্রেম ছিল খালি মজার প্রেম, ভোমরার প্রেম, তা এককে নিয়ে কোনদিন খুসি হ'তে শেখে নি। কিন্তু সেই হাল্‌কা প্রেমও ছিল এমন মিষ্ট, যে একবারমাত্র তাকে পেয়েছে সেও কখনো তার উপরে রাগ করতে বা তাকে ভুলতে পারতনা।

পলিনের অনুগৃহীত ও অনুগ্রহ-প্রার্থী বন্ধুরা যেমন তার জন্যে নিত্য নূতন প্রশস্তি রচনা করত, তার শত্রুদেরও বিষাক্ত রসনা তেমনি তার বিরুদ্ধে নিত্য-নূতন অভিযোগ সৃষ্টি করতে ক্ষান্ত হয় নি। কোন কোন অভিযোগ হ'ত গুরুতর, এমন কি ভয়াবহ ! বহু অশ্রুতপূর্ব্ব ও একান্ত-কুৎসিত ব্যভিচারের জন্যে তাকে দায়ী করা হ'ত। নেপোলিয়নের ভগ্নীদের মধ্যে পলিনই ছিল বেশী কুখ্যাত। কিন্তু এজন্যে তার সুন্দর মুখে

কখনো একটিমাত্র বিরক্তির রেখাও দেখা যায়নি, সব সে হেসেই দিত উড়িয়ে।

নেপোলিয়নের হুকুমে মাঝে মাঝে তাকে স্বামীর সঙ্গে রোম ও টিউনিস প্রভৃতি সহরে গিয়ে বাস করতে হয়েছে এবং এইখানেই ছিল তার চরম আপত্তি। নিজের ও ধনকুবের স্বামীর বিপুল আয়ে রোম ও টিউনিস সহরেও তার কোন বিস্ময়কর আকাজ্ক্ষাও অপূর্ণ থাকেনি বটে, কিন্তু তবু বিদেশে তার বন্য কল্পনা তুষ্ট হ'তে পারেনা, য়ুরোপীয় সভ্যতার আধুনিক লীলামঞ্চ হচ্ছে পারী-সহর, পলিনের সমস্ত দিবাস্বপ্ন সফল হ'ত কেবল সেইখানেই, তার উদ্দাম নিশ্চিন্ত জীবনের উপযোগী পৃষ্ঠপট প্রস্তুত হ'ত কেবল সেইখানেই! কাজেই দুদিন পরেই আবার পারী-নগরের বিপুল জনতা-প্রবাহের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে সে সব ছেড়ে পালিয়ে না এসে পারত না।

আর এক অদ্ভুত বাতিক ছিল এই আশ্চর্য্য মেয়েটির—হুল্লোড় ও যৌবনোৎসবের মধ্য দিয়েই তার জীবন কেটে যেত বটে, কিন্তু তার সব-চেয়ে অনুরাগী :বন্ধু ছিলেন উচ্চশ্রেণীর পুরোহিতরাই। তাই তার আনন্দ-সভায় যোগ দিতেন কার্ডিনালরা দলে দলে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে পলিনের মৃত্যু হয়। কিন্তু মরণ-কালেও তার স্বভাব বদলায় নি। প্রাণের কাণে মৃত্যুর পদশব্দ শুনেই সে নিজের দেহকে প্রস্তুত করতে প্রবৃত্ত হ'ল, কারণ মৃত্যুও যে পুরুষ, যথাযোগ্য বসনে-ভূষণে তার সঙ্গে দেখা না করলে চলবে কেন? মৃত্যুকে ভয় করা যখন অসম্ভব, তখন সে যেন চাইলে তাকে মুগ্ধ করতেই!

অতএব পলিন পরলে তার বাছা বাছা জমকালো সাজপোষাক সব-চেয়ে দামী দামী গহনা। দাসীদের হুকুম দিলে, "আমার চুল ভালো ক'রে আঁচড়ে দাও, মুখে ভালো ক'রে রং-পাউডার মাখিয়ে দাও, সর্ব্বাঙ্গে নানা পুষ্পসারের ধারা ঢেলে দাও।"

তারপর ব্যাধি-অবশ থর-থর কম্পিত হাতে একখানি আয়না নিয়ে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজের মুখ দেখলে। কেননা পরলোক-যাত্রা হচ্ছে তার জীবনের স্মরণীয় সর্ব্বশেষ শোভাযাত্রা।

তখনো—সেই চিরনিদ্রা ও চরম বিস্মৃতির পূর্ব্ব মুহূর্ত্তেও তার ভবিষ্য-চিন্তা! সে বললে, "মরবার পর আমার মুখ পুরু ঘোমটায় ঢেকে দিও।" মৃত্যুযন্ত্রণায় বিকৃত মুখ কেউ যদি দেখে, এই ছিল তার ভয়!

নিজের দেহই ছিল পলিনের সাধনার বস্তু, আয়নাতে নিজের মুখ দেখতে-দেখতেই তার চোখের সামনে ঘনিয়ে এল মৃত্যু-আঁধার। তাকে দেখে মৃত্যু বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল কিনা, মানুষের ইতিহাসে তা প্রকাশ পায়নি।

তখন তার বয়স মোটে পঁয়তাল্লিশ বৎসর, এবং তখনো সে সুন্দরী।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যখন অন্তিম শ্বাস ত্যাগ করেন, তার অনেক আগেই তাঁর দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন ফুরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু পলিন বোনাপার্ট তার তনু-পসরা সাজাতে সাজাতে পরলোকে বেড়াতে গেল সগৌরবে বিজয়িনী রূপেই।

একটি নাটকীয় দৃশ্য

ক্যাথারাইন ছিলেন অপরের পত্নী। সুন্দরী ক্যাথারাইন! তাঁকে পছন্দ করলে রুসিয়ার সম্রাট পিটার দি গ্রেটের চোখ।

পিটার দি গ্রেটের নাম সারা পৃথিবীর ইস্কুলের ছেলেরাও জানে। মনের শক্তি তাঁর অমানুষিক, বুদ্ধি ও প্রতিভা তাঁর অতুলনীয়। আজ যে অর্দ্ধ-সভ্য রুসিয়া প্রতীচ্যের একটি প্রধান অংশ রূপে গণ্য হয়েছে, তার মূলে আছে পিটারেরই প্রাণপণ চেষ্টা।

কিন্তু আর একদিক দিয়ে পিটার ছিলেন পশুরও অধম। তিনি প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন নিজের একমাত্র পুত্রকে। এবং যখন তাঁর কামের আগুন জ্বলে উঠত তখন তিনি বয়স বিচার করতেননা—এমনকি স্ত্রী-পুরুষ কারুকেই ছাড়তেন না!

পিটার সর্ব্বশক্তিমান সম্রাট। পছন্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্যাথারাইনকে গ্রহণ করলেন উপপত্নী রূপে। বাধা দেয় কে?

কিছুকাল পরে ক্যাথারাইনকে তিনি বিবাহ করলেন। একদিকে বর্ত্তমান পিটারের স্ত্রী রুসিয়ার সম্রাজ্ঞী ইউদোক্সিয়া; এবং অন্যদিকে জীবিত কাথারাইনের স্বামীও। খৃষ্টানদের মধ্যে এমন বিবাহ অসম্ভব। কিন্তু রুসিয়ার সম্রাট পিটার ছিলেন এদিক দিয়ে ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর মত—যিনি নিজের মেয়েকেও (অবশ্য উপপত্নীর গর্ভজাত) বিবাহ করতে ছাড়েননি! পাদ্রীরা আসেন "অসভ্য" ভারতবর্ষে "আলোক" বিতরণের জন্যে; কিন্তু পিটারের হুকুমে তাঁরা দুই চোখে অন্ধকার দেখেও এক্ষেত্রে বিয়ের মন্ত্র পড়তে কিছুমাত্র আপত্তি করলেন না।



একটি নাটকীয় দৃশ্য

পিটারের প্রথম স্ত্রী সম্রাজ্ঞী ইউদোক্সিয়াকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল একটি মঠে বা ভিক্ষুণী সংঘে সন্ন্যাসিনী রূপে। তাঁর আসন অধিকার করলেন ক্যাথারাইন। উপপত্নী হলেন সম্রাজ্ঞী!

ইতিহাসে ক্যাথারাইনের অনেক সদ্গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। পিটারের মধ্যে যখন জেগে উঠত হিংস্র পশুত্ব ও রক্ত-পিপাসা, তিনি তা সংযত করবার চেষ্টা করতেন যথাসাধ্য। আরো নানাদিকে তিনি ছিলেন গুণবতী।

কিন্তু পিটারের মতন স্বামীকে বড়-জোর দেহ দেওয়া যায়, মন দেওয়া অসম্ভব। দাবানলকে মানুষ ভয় করতে পারে, ভালোবাসতে পারেনা।

ক্যাথারাইনের গার্হস্থ্য-বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন মোয়েন। তিনি যুবক আর রূপবান। কাজের খাতিরে সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে মোয়েনের প্রায়ই দেখাশোনা ও কথাবার্ত্তা হ'ত। মৌখিক আলাপ ক্রমে পরিণত হ'ল আন্তরিক প্রেমে।

রাজবাড়ীর ও রাজসভার সবাই ব্যাপারটা জানতে পারলে—কেবল পিটার ছাড়া। তিনি একদিকে রাজকার্য্য ও যুদ্ধবিগ্রহ এবং অন্যদিকে সুরা আর নারী নিয়ে ব্যস্ত। বাঘের গর্ত্তে যে খরগোস বাসা বাঁধবে, হয়তো এতটা তিনি ধারণায় আনতে পারেননি।

অবশেষে জাগ্রত হ'ল তাঁর সন্দেহ। তিনি গুপ্তচর নিযুক্ত করলেন। তারপর একদিন আড়াল থেকে স্বচক্ষে দেখলেন প্রেমিক-প্রেমিকার সমস্ত লীলাখেলা। উন্মত্ত হয়ে উঠল পিটারের পশুত্ব।

প্রথম ক্রোধের প্রচণ্ড আবেগে পিটার দুই অপরাধীকেই একসঙ্গে হত্যা করতে উদ্যত হলেন।

কিন্তু বুদ্ধিমান বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন, "সম্রাট, এখন এদের বধ করলে

রাজ্যের সবাই এই কেলেঙ্কারির কথা জানতে পারবে। অন্ত ব্যবস্থার দরকার।"

অন্ত ব্যবস্থাই হ'ল। সকলে জানলে, সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে মোয়েন ও তার ভগ্নী আনীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখানে এ-কথাও ব'লে রাখা ভালো, আনীও ছিলেন পিটারের উপপত্নী!

পাছে বন্দীদের মুখে কলঙ্ককাহিনী প্রকাশ পায়, সেই ভয়ে পিটার তাদের ত্রিসীমানায় আর কারুকে যেতে দিতেন না। সম্রাট স্বহস্তে নিয়ে যেতেন বন্দীদের খাবার!

কিন্তু মোয়েনের প্রেম ছিল খাঁটি। সম্রাজ্ঞীর লজ্জার কথা কখনোই সে প্রকাশ করতনা।

কারণ তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগকেই সে সত্য ব'লে স্বীকার করলে। পাছে সম্রাজ্ঞীর নিন্দা রটে, সেই ভয়ে মোয়েন বললে, "হ্যাঁ, আমি অপরাধী। সম্রাটের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছি।"

বিচারে মোয়েনের হ'ল প্রাণদণ্ড। আনীকে বেত্রাঘাত ক'রে সাইবেরিয়ার পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল।

বধ্যভূমি। চারিদিকে লোকারণ্য। শেষ-দৃশ্যটা উপভোগ করবার জন্যে সম্রাটও উপস্থিত।

ঘাতকের কুঠার উঠল এবং নামল। হতভাগ্য মোয়েনের মুণ্ডহীন দেহ মাটিতে প'ড়ে ছটফট করতে লাগল।

কিন্তু তবু পরিতৃপ্ত হ'লনা পিটারের নিষ্ঠুরতা। তিনি হুকুম দিলেন, "একটা খুঁটির ওপরে মুণ্ডটা বসিয়ে দাও।"

খুঁটির উপরে মোয়েনের রক্তাক্ত ছিন্নমুণ্ড দৃষ্টিহীন দৃষ্টি মেলে স্থির হয়ে রইল।

পিটার বললেন, "সম্রাজ্ঞীকে ডেকে আনো।"

ক্যাথারাইন সেখানে এসে দাঁড়ালেন।

পিটার কঠোর হাসি হেসে বললেন, "সম্রাজ্ঞী, ওদিকে চেয়ে দেখ। আমার ইচ্ছা ঐ খুঁটির চারিদিকে তুমি একবার ঘুরে এস।"

নীরব পাথরের মূর্ত্তির মত ক্যাথারাইন দেহহীন প্রিয়তমের সেই চুম্বনাস্পদ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

পিটার তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলেন, সম্রাজ্ঞীর মুখের উপরে নিদারুণ যন্ত্রণার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় কিনা!

কিন্তু ক্যাথারাইনের মুখ একেবারে শান্ত। ধীর অথচ দৃঢ় পদে তিনি খুঁটিটাকে প্রদক্ষিণ ক'রে এলেন। বাইরের জগতের কেউ জানতে পারলেনা তাঁর গোপন প্রাণের ক্রন্দনের ইতিহাস।

সম্রাট মনে মনে গুম্‌রোতে লাগলেন, নিষ্ফল আক্রোশে।

এর পর পিটার আর কোনদিন ক্যাথারাইনের শয়নগৃহে প্রবেশ করেননি।

ডেভিড গ্যারিক

ডেভিড গ্যারিক (১৭১৭-১৭৭৯) আজ অমর হয়ে আছেন। বিয়োগান্ত নাটকে অভিনয় ক'রে তিনি সমগ্র ইংরেজ জাতির এতখানি শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হয়েছিলেন যে, ব্রিটানিয়ার সুসন্তানরূপে তাঁর দেহ ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবির জাতীয় সমাধি-গৃহে আশ্রয় লাভ করেছে, ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণীগণের সঙ্গে।

কিন্তু পেগ ওফিংটনের নাম আজ কে জানে? সুন্দরী পেগ এক সময়ে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী রূপে সকলের সুপরিচিত ছিল—লোকের মুখে মুখে ফিরত তার নাট্যনিপুণতার আর প্রেমের কাহিনী। পেগ না থাকলে আজ গ্যারিককে কেউ চিনত না। কিন্তু পেগ ওফিংটনের নাম আজ বিশ্রাম করছে বিস্মৃতির গর্ভে।

আজ আমরা পেগের প্রেমের গল্প বলব। এই গল্পের ভিতরে গ্যারিকের গুপ্ত চরিত্র ও হীন মনোবৃত্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। যবনিকার অন্তরালে গ্যারিক যে কোন্ শ্রেণীর জীব ছিলেন এ কথা যাঁরা জানতে চান, তাঁরা পেগ ওফিংটনের এই সংক্ষিপ্ত কিন্তু সরস জীবনকাহিনী পাঠ করুন।

কাজল-কালো চোখ, ধনুকের মতন সুবঙ্কিম ভুরু, সমুজ্জল লোহিত ও পিঙ্গল বর্ণ কেশদাম এবং প্রবাল-রাঙা ওষ্ঠাধর—এইগুলি ছিল পেগের অস্ত্র। তার উপরে ছিল তার প্রাণ-পাগল-করা হাসি,—দুর্ভেদ্য হৃদয়-দুর্গও সে-হাসির চোটে ভেঙে পড়তে বিলম্ব হ'ত না।

ডুরি-লেনের মিষ্টি নেলের গল্প আগেই বলেছি। তার মতন পেগও নিম্নশ্রেণীর ভিতর থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে। সাত বছর বয়স থেকেই পেগ ম্যাডাম ভায়োলেটির acrobatic রঙ্গমঞ্চে "তারকা" নটীরূপে অভিনয় সুরু করে। বারো বছর বয়সের ভিতরেই সে সকল রকম ভূমিকাতেই অভ্যস্ত হয়,—এমন-কি ঐ কচি বয়সে পেগকে বুড়ীর ভূমিকাতেও অবতীর্ণ হ'তে হয়েছিল! নকল করবার শক্তি ছিল তার আশ্চর্য্য রকমের!

তারপর পালোয়ানি প্যাঁচে ভরা অভিনয় ছেড়ে মিষ্টি নেলের মতন পেগও কিছুদিন রঙ্গালয়ের প্রেক্ষাগারে কমলালেবু বিক্রয়ের কাজ করে। এই সময়ে তার মনে লণ্ডনের থিয়েটাররে আসল অভিনেত্রী হবার সাধের উদয় হয়। মাত্র সতেরো শিলিং পকেটে নিয়ে পাড়াগাঁ ছেড়ে সে লণ্ডনে চ'লে আসে। নানা রঙ্গালয়ে কর্ম্ম প্রার্থনা করে। উনিশটি রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাকে বিদায় ক'রে দেন। তারপর কভেণ্ট গার্ডেন থিয়েটারে সে চাকরি পায়। প্রথম ভূমিকাতেই সে এমন কৃতিত্ব দেখালে যে, তার যশ জনসাধারণের মুখে মুখে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অল্প দিনের ভিতরেই সে বিলাতের একজন প্রধানা অভিনেত্রী ব'লে গণ্য হ'ল! তখনো তার বয়স আঠারো-উনিশ পেরিয়ে যায় নি।......এর পর থেকেই তার জীবনকাহিনী উপন্যাসের মতন বিচিত্র।

পেগের প্রেম নতুন নতুন ফুলে মধুচয়ন করতে লাগল—হৃদয়ের পর হৃদয় তার চরণে উপহৃত হ'তে লাগল। তারপর হঠাৎ তার নাম এক নরহত্যার মামলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল।

ডাক্তার হ্যালাম ছিল পেগের অনেক প্রণয়ীর ভিতরে একজন। কিছুদিন পরে পেগ শ্রান্ত হয়ে হ্যালামকে বিদায় ক'রে দিলে। সেই

রাগে পেগের নামে নানারকম গল্প রচনা ক'রে হ্যালাম চারিদিকে রটিয়ে বেড়াতে লাগল। মনের দুঃখে সাশ্রুনেত্রে পেগ, ম্যাকলিন নামে আর এক অভিনেতার (এবং সম্ভবত তার প্রণয়ী) কাছে গিয়ে বিপদের কথা বলল।

তখন ডুয়েলের যুগ চলছে। ম্যাকলিন কিন্তু পিস্তল বা তরবারির জন্যে অপেক্ষা করলে না। ক্ষাপ্পা হয়ে তখনি ডাক্তার হ্যালামের বাড়ীতে ছুটে গেল এবং হ্যালামকে বেশ ঘা-কয়েক দিয়ে বললে, ফের যদি সে পেগের দুর্নাম রটায় তা'হলে দেখতে পাবে মজাটা! ডাক্তারের কাছে ছিল তরবারি, সে তাই নিয়ে ম্যাকলিনকে আক্রমণ করলে। ম্যাকলিন পাশ কাটিয়ে আক্রমণ এড়িয়ে হাতের বেতের ছড়ী দিয়ে ডাক্তারের মুখে মারলে এক খোঁচা! ছড়ী ডাক্তারের চক্ষু ভেদ ক'রে একেবারে মস্তিষ্কে গিয়ে ঠেকল এবং ডাক্তার তখনি মারা পড়ল। ম্যাকলিন বন্দী হ'ল, কিন্তু আদালতের বিচারে পরে মুক্তিলাভ করলে।

ঠিক এই ঘটনার পরেই পেগের সঙ্গে গ্যারিকের দেখা হয়। গ্যারিক একটি ছোটখাটো মানুষ—তাঁর আকার কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করত না। তবে তাঁর মুখ-চোখ ছিল সুশ্রী ও তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল মধুর। ব্যবসায়ে তিনি শুঁড়ী ছিলেন। এত লোক থাকতে পেগ যে তাঁকেই পছন্দ ক'রে বেছে নিলে, এজন্যে তিনি নিজেই কম অবাক হন নি।

গ্যারিক মদের ব্যবসায়কে ঘৃণা করতেন। তাই শুনে পেগ তাঁকে রঙ্গালয়ে আসতে অনুরোধ করলে। গ্যারিক রাজি হ'লেন না। পেগ তখন তাঁকে বুঝিয়ে দিলে জনপ্রিয় অভিনেতারা কত বেশী মাহিনা পান। গ্যারিকের স্বভাব ছিল অত্যন্ত কৃপণ। টাকা রোজগারকেই তিনি জীবনের একমাত্র কাম্য ব'লে ভাবতেন। পেগের মুখে অভিনেতার

মাহিনার পরিমাণ শুনেই তাঁর আর কোন আপত্তি রইল না, তিনি নট-জীবন গ্রহণ করলেন।

পেগ তখন নিজেই গ্যারিকের অভিনয়-শিক্ষার ভার গ্রহণ করলে। পেগের শিক্ষাগুণে গ্যারিক অল্পদিনের ভিতরেই যশস্বী হয়ে উঠলেন।

গ্যারিকের মতন স্বভাবের লোকের কাছ থেকে যতটা ভালোবাসা আশা করা যায়, ততটা ভালোবাসা থেকে পেগ অবশ্য বঞ্চিত হয় নি। গ্যারিক যখন চরম যশের শিখরে উঠেছেন, অসংখ্য নারী তখন তাঁর প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু পেগ যতখানি ভালোবেসেছিল গ্যারিককে, ততখানি ভালোবাসতে আর কেউ পারে নি। তাঁরা দুজনে একসঙ্গে অনেক ভূমিকায় অভিনয় করলেন। তারপর তাঁদের আসন্ন বিবাহের সংবাদ প্রচারিত হ'ল।

কিন্তু বিবাহের নির্দিষ্ট তারিখ বারবার পিছিয়ে গেল—গ্যারিকের আপত্তির জন্যে। বিবাহ যেই আসন্ন হয় অমনি গ্যারিকেরও দুর্ভাবনা হয়, বিবাহের জন্যে অতিরিক্ত খরচ করতে হবে তো! সংসারের খরচ তাঁরা পালা ক'রে চালাতেন। এক মাস পেগের টাকায় সংসার চলত, আর এক মাস গ্যারিকের টাকায়। বাড়ীতে যে-সব অতিথি-অভ্যাগত আসতেন, সাধারণত তাঁরা ছিলেন গ্যারিক ও পেগ দুজনের বন্ধু। কিন্তু তাঁরা শীঘ্রই ধ'রে ফেললেন গ্যারিক ও পেগের অতিথি-সৎকারের পার্থক্যটা। ফলে কিপ্টে গ্যারিকের পালার সময়ে বাড়ীতে সহজে অতিথি-অভ্যাগত আসতে রাজি হ'তেন না—তাঁরা পেগের পালার অপেক্ষায় থাকতেন।

শেষটা বিবাহের দিন যখন আর পিছিয়ে দেওয়া চলে না, গ্যারিক তখন বাধ্য হয়ে পেগের জন্যে একটি বিবাহের আংটি ক্রয় করলেন। কিন্তু

এই আংটি কেনবার জন্যে টাকা খরচ হওয়াতে গ্যারিকের মনে কিছুমাত্র শান্তি ছিল না। আংটিটি পেগকে উপহার দিতে গিয়ে গ্যারিক মনের কষ্টে ফোঁস ক'রে এক প্রবল দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। পেগের মেজাজ গেল চ'টে। সে বেঁকে ব'সে বললে, "তোমার মতন কিপ্টে লোককে, আমি কখনই বিবাহ করব না!"

গ্যারিকের ধড়ে যেন প্রাণ এল। তিনি বললেন, "তুমি আমাকে বাঁচালে পেগ! বিয়ের জন্যে আমি অত টাকা খরচ করতে পারব না। তুমি আমাকে মুক্তি দাও।"

পেগ বললে, "বেশ, তাই সই।"

গ্যারিক বিদায় হলেন। তিনি যে-সব উপহার দিয়েছিলেন, পেগ আবার তাঁকে সেগুলি ফিরিয়ে দিলে। কিন্তু পেগের কাছ থেকে তিনি যে-সব মূল্যবান উপহার পেয়েছিলেন, তার একটিও তিনি ছাড়তে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, "পেগ, এগুলি আমার কাছে থাক্, কারণ এ-সব জিনিষ আমাকে তোমার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।"

পেগ রাগের মাথায় বিদায়কালে গ্যারিককে সদয় কথা বললে না, কঠিন সত্য-কথাই বললে। তারপরে গ্যারিকের সামনে যখনই পেগের নাম উঠত, তিনি তার চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করতে ছাড়তেন না। অথচ এই পেগের জন্যেই তিনি সমস্ত যশ ও অর্থ অর্জ্জন করেছেন এবং এই পেগের কাছেই তাঁর অভিনয় শিক্ষার হাতে খড়ি! গ্যারিকের ভক্তরাও পেগকে ছলা-কলাময়ী দুষ্টা নারী ব'লেই জানত। কিন্তু সেই দুর্নীতির যুগে একাধিক প্রণয়ীর জন্যে পেগকে দোষী করলে চলবে না—তখন একাধিক প্রণয়ী অনেকেরই ছিল। এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ করা চলে না।

গ্যারিকের পর এক রহস্যময় পুরুষ পেগের প্রেমাস্পদ হন। সম্ভবত তিনি কোন রাজকুমার। কিছুদিন পরে ইনি সমাজের কোন ভদ্রমহিলার প্রতি আসক্ত হন, কিন্তু পেগের কাছে আগেকার মতই মৌখিক ভালোবাসা জানাতে থাকেন। পেগ এ-ব্যাপারটা টের পেলে। জেনেও আর আর সাধারণ মেয়ের মতন সে কান্নাকাটি বা রাগারাগি করলে না। এক মুখোস-পরা বলনাচের সভায় সে পুরুষের বেশে হাজির হয়ে তার প্রতিযোগিনীর কাছে রাজকুমারের সম্বন্ধে এমন-সব ভয়ানক গল্প বললে যে, মহিলাটি শুনে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন! তারপর রাজকুমার তার কাছে আর ঘেঁসতে পারেন নি।

অভিনেত্রী পেগের যশসৌরভের সঙ্গে সঙ্গে ধন-দৌলতও বেড়ে উঠতে লাগল। কিন্তু তার যত্র আয় তত্র ব্যয়! সে তার মাকে খুব সুখে রাখলে। তার বোন মেরীও তারই কাছে মানুষ হ'তে লাগল। এবং আর্ল অফ চোল্ মন্‌ডিলির পুত্র যখন মেরীকে বিবাহ করলেন, পেগ তখন তার ভগ্নীপতিরও ভারগ্রহণ করলে।……বিবাহের আগেই বুড়ো আর্ল ছেলের কীর্ত্তি শুনে রেগে তিনটে হয়ে পেগের কাছে এসেছিলেন, এই বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙবার জন্যে। কিন্তু পেগের সামনে এসে তার রূপ দেখে বুড়োর মাথা এমন ঘুরে গেল যে তিনি এই ভাবতে ভাবতে খুসি হয়ে ফিরে গেলেন,—আমাব ছেলের যে এমন রূপসী শ্যালিকা হবে, এ একটা মস্ত গর্ব্ব ও ভাগ্যের কথা!

পেগের শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়ল, কিন্তু তবু সে রঙ্গমঞ্চের মায়া ছাড়তে পারলে না। একদিন সে রোসালিণ্ড রূপে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হ'ল—তাকে দেখে সমস্ত দর্শক আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। সেদিন তার মোহিনী মায়ায় ভরা চোখদুটি আরো সুন্দর দেখাচ্ছিল বটে, কিন্তু

অভিনয় সুরুর সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ভাব কেমন অস্বাভাবিক হয়ে এল। তার দেহ কাঁপতে লাগল। তারপর সে ভয়-ভরা গলায় এই পংক্তি আবৃত্তি করলে—"When I make courtsy—bid me—bid me—farewell",—তারপরেই দু'হাত শূন্যে তুলে "Oh God" ব'লে চেঁচিয়ে উঠে টলতে টলতে ভিতরে চ'লে গেল। সকলে তখনি শুনলে, পেগ হঠাৎ পক্ষাঘাত রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। চারিদিকে হাহাকার উঠল, কারণ সকলেই তাকে ভালবাসত।

বৃদ্ধ রোমিওর তরুণী জুলিয়েট

আডা আইজ্যাক্‌স্ মেন্‌কেনের নাম শুনেছেন? কবি ও শিল্পীর প্রেয়সী হয়ে যে-সব যুবতী আজ ইতিহাসে আপন আপন রূপযৌবনের অক্ষয় ছাপ্ রেখে গেছে, মেন্‌কেন্ হচ্ছে তাদেরই একজন। দুর্দ্দমনীয় যৌবন ও বিলাসিনী কল্পনা, মেন্‌কেন্ ছিল এদেরই সেবাদাসী।

তার যৌবনের বিচিত্র অভিযানে ক্ষণে ক্ষণে দেখা যায় জয় ও পরাজয়, বিবাহ ও বিবাহচ্ছেদ, প্রেমের উত্থান-পতন—মেঘ ও রৌদ্র! তার চিত্ত ছিল কবিত্বে ভরা, তাকে অনায়াসেই উনবিংশ শতব্দীর ফ্রাইন্ বলা চলে। আমেরিকায় তার জন্ম (১৮৩৫) এবং তার আসল নাম ডোলোরেস্ আডিয়স্।

প্রায় শৈশবেই সে রঙ্গালয়ে গীতিনাট্যাভিনয়ে নর্ত্তকীর দলে যোগ দেয় এবং দু-দিনেই বিজ্ঞাপনের মহিমায় বিখ্যাত হয়ে ওঠে। মাত্র বারো বছর বয়সেই সে নাকি স্পেনীয় ও ফরাসী ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারত, লাটিন ও গ্রীক ভাষায় বই পড়তে পারত এবং গোটা ইলিয়ডখানা ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ ক'রে ফেলেছিল! কিন্তু তরুণ বয়সেই অর্জ্জিত এই বিদ্যা, বুদ্ধি ও প্রতিভার সঙ্গে তার প্রেম ও যৌবন কোনদিনই তালরক্ষা ক'রে চলতে পারে নি। তার নাচ দেখতে দেখতে তাই অগণ হুইস্কির গেলাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত।

সতেরো-আঠারো বা বিশ বৎসর বয়সে তার প্রথম বিবাহ হয়। কিন্তু কার সঙ্গে এবং কেন যে সে বিবাহ-বন্ধন স্থায়ী হয় নি, সে কথা

কেউ জানে না। তার দ্বিতীয় স্বামী হচ্ছেন একজন ইহুদী সঙ্গীতবিদ, নাম অলেকজাণ্ডার আইজ্যাক্‌স্ মেন্‌কেন্। দুদিন পরে তিনিও ছায়ার ভিতরে মিলিয়ে গেলেন। এই সময়ে নর্ত্তকীর দল থেকে নাম কাটিয়ে সে সাংবাদিকের জীবন গ্রহণে উদ্যত হয়। কিন্তু তারপরেই আবার নিউ ইয়র্কে গিয়ে রঙ্গালয়ে অভিনেত্রী রূপে যোগ দেয় এবং পৃথিবীবিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা জন সি হীনানকে তৃতীয় স্বামীর পদে বরণ করে। তার অভিনয়-শক্তি উল্লেখযোগ্য ছিল না, তবু যে দর্শকরা তাকে সহ্য করত, সে কেবল তার লীলাচপল যৌবনের উগ্র মাদকতায়। কিন্তু নির্ব্বোধের মত সে যখন "ম্যাক্‌বেথ" ভূমিকা গ্রহণ করলে, মেন্‌কেনের লোভনীয় যৌবনও তখন তাকে আর দর্শকদের ক্রুদ্ধ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ থেকে রক্ষা করতে পারলে না। সেক্সপিয়ারের নাটকে মাত্র রূপসুন্দর যৌবন কোনই কাজে লাগে না। বিখ্যাত অভিনেতা মার্ডক্ তাকে ডেকে বললেন, "তুমি উত্তেজক কোন-কিছু করবার চেষ্টা দেখ। রঙ্গমঞ্চের উপরে কেবল হাসবার সময় ছাড়া তুমি মুখ খুলো না।"

এমন কোন কোন মেয়ে আছে, যারা স্যাঁৎসেতে মেঘলা দিনকে একঘেয়ে মনে হ'লেই:খাঁ-ক'রে বিয়ে ক'রে ফেলে। মেন্‌কেনও হয়তো সেই দলের মেয়ে। তৃতীয় স্বামীকে পরিত্যাগ ক'রে এবারে সে ইংলণ্ডে গিয়ে নটী লীলা সুরু করলে। তার রূপের ঢেউ স্যাম্পেনের মত লণ্ডনের যুবজনদের হৃদয়কে উত্তেজিত ক'রে তুলল, কারণ সে প্রায়-নগ্ন দেহে মঞ্চের উপরে দেখা দিত। গুরুজনদের হিতোপদেশ ও চোখরাঙানি ব্যর্থ ক'রে দলে দলে নবীন ও প্রবীণ রসিকের দল তার হোটেল-বাড়ীর দরজার সুমুখে বিপুল জনতার সৃষ্টি করলে। এই ভিড়ের মধ্যে চার্লস্ ডিকেন্স, চার্লস্ রীড্, ওয়াট্‌স্ ও জন অক্সেন্‌ফোর্ড প্রমুখ নামজাদা সাহিত্যিক-

শিল্পীদেরও মুখ দেখা গেল! প্রেম-পাগলা কবি সুইন্‌বার্ণ মহা উৎসাহে প্রাণের সমস্ত আবেগ কলমের মুখে বর্ষণ ক'রে মেন্‌কেনের খাতায় স্বহস্তে একটি কবিতা লিখে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রেমে উন্মাদগ্রস্থ হ'ল সুইন্‌বার্ণের সেক্রেটারী টম্‌প্‌সন পর্য্যন্ত।

*   *   *   *

কিন্তু এতগুলি বিখ্যাত হৃদয়ও মেন্‌কেন্‌কে ইংলণ্ডের মধ্যে বন্দিনী ক'রে রাখতে পারলে না। সেখানেও সে চতুর্থ স্বামী গ্রহণ ও ত্যাগ ক'রে বোধ হয় অন্যমনস্ক ভাবেই পঞ্চম বিবাহ ক'রে ফেলেছিল। তারপর পঞ্চমকেও ভুলে সে ফ্রান্সে গিয়ে নতুন আসর পেতে বসল। ঔপন্যাসিক ডুমা চিরদিনই ছিলেন তার মনের মানুষ। সে প্রায়ই বলত, "আমি যদি ফ্রান্সে যাই তাহ'লে অসাধারণ মানুষ ডুমার উপপত্নী হব!"

ফ্রান্সেও গতিয়ের প্রমুখ কবি ও লেখকের দল মেন্‌কেনকে নিয়ে মেতে উঠলেন রীতিমত। তারপর একদিন রঙ্গালয়ে অভিনয় করতে করতেই সে তার বহুকামনার ধন ডুমার সাক্ষাৎ পেলে। ডুমার যৌবনের স্বপ্ন তখন ভেঙে গেছে—তাঁর বয়স পঁইষট্টি, দেহ এমন মোটা যে তাঁকে দেখলেই মনে হয় যেন একটি পোষাক-পরা হিপোপটেমাস! কিন্তু মেন্‌কেনের প্রেমিক দৃষ্টি কদাকার বার্দ্ধক্যকেও আমলে আনলে না, প্রায়-নগ্নদেহেই ছুটে গিয়ে সে নিজের পুষ্টশ্রী পেলব বাহুলতা দিয়ে বুড়ো ডুমার মোষের মতন মোটা গলা জড়িয়ে ধ'রে তাঁকে প্রবল আবেগে আলিঙ্গন করলে! ডুমা ভারি খুসি! যৌবনীরা তাঁর পাকা গোঁফ দেখে কাছে ঘেঁসে না ব'লে ব'লেই তিনি এখন নজরকে সংযত ক'রে রেখেছেন, নইলে বহুহৃদয়জয়ী ডুমার তরুণ হৃদয় জয় করবার আশা তখনো মেটেনি! সুতরাং আত্মদান করতে তাঁরও বিলম্ব হ'ল না। আর সে কী আত্মদান!

শত শত গুণী ধনী ও সুন্দর যুবককে কলা দেখিয়ে ডুমা তাঁর নূতন প্রণয়িনীকে নিয়ে দেশান্তরে প্রস্থান করলেন এবং সেখান থেকে পুত্রকে (ছোট ডুমাও তখন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক) পত্র লিখলেন, "বুড়ো বয়সে আমি আমার শান্তিকে খুঁজে পেলুম !" বৃদ্ধ পিতাকে আবার ছোকরা রোমিওর ভূমিকায় দেখে ছোট ডুমার ক্রোধ ও লজ্জার সীমা রইল না ! কিন্তু বুড়ো ডুমা নূতন প্রেমে অটল !......

অল্পদিন পরেই প্যারি সহরের পথে পথে এক অদ্ভুত ফোটো ফিরি হ'তে লাগল—এক গর্ব্বময় হাসিমুখ বৃদ্ধের মোটা দেহ জড়িয়ে এক তরুণী মৃদু মৃদু হাসছে। তলায় ডুমা ও মেন্‌কেনের নাম লেখা। বৃদ্ধ সাহিত্যিকের এই অশোভন তরুণী-প্রীতি দেখে সারা প্যারি সহর অট্টহাস্য করতে লাগল এবং প্যারি সহর যখন অট্টহাস্য করে তখন তার প্রতিধ্বনিও ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র য়ুরোপে ! সাময়িক কাগজ-ওয়ালাদের ব্যঙ্গনিপুণ কলমগুলো অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠল, কবি ভ্যার্লেন একটি ব্যঙ্গ-কবিতাও লিখতে ছাড়লেন না ! তখন হতভাগ্যবৃদ্ধ প্রেমিকের হুঁস হ'ল ! রাগ ক'রে তিনি মেন্‌কেন্‌কে ছেড়ে চ'লে এলেন এবং যত-নষ্টের-গোড়া সেই ফোটোগ্রাফারের নামে মানহানির মামলা রুজু ক'রে দিলেন।

ডুমাই তুলেছিলেন মেন্‌কেনের প্রেমময় চিত্ত-বীণায় শেষ-কামদের ঝঙ্কার ! তারপরেই সে এমন এক শক্ত অসুখে পড়ল যে, তাকে নটী জীবন পর্য্যন্ত ছেড়ে দিতে হ'ল। পাদপ্রদীপের তীব্র দীপ্তি নেই, জীবন-ধারণের উপযোগী অর্থ নেই, বুভুক্ষু যুবাদের প্রেম-নিবেদন নেই,—সজ্জাহীন ছোট্ট একখানা ঘর, চারিদিকে আদুড় মলিন দেওয়াল, মাঝখানে রোগশয্যায় শুয়ে আর্ত্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেবল একদা-সুন্দরী মেন্‌কেন্।

বৃদ্ধ রোমিওর তরুণী জুলিয়েট

প্যারি সহরের বিরাট, উদাসীন হৃদয়-স্পন্দন কোনদিন থামেনি, কিন্তু নাগরিকদের দুলালী যুবতী মেন্‌কেনের হৃদয়-স্পন্দন হঠাৎ একদিন থেমে গেল—নগরের পথে পথে তখন উৎসবময় জনতা লুই নেপোলিয়নের বিজয়-ভেরীর বাজনা শুনে আনন্দগান গেয়ে ছুটে চলেছে! মৃত্যুর সময়ে মেন্‌কেনের বয়স হয়েছিল মাত্র তেত্রিশ বৎসর!



ভল্‌তার

"For a countess I'll make thee,
My own pretty maid."

এদেশে নয়,—বিলাতের রঙ্গমঞ্চে যে সব রূপসী তরুণী অভিনয় বা নৃত্যাদি করেন, তাঁদের প্রত্যেকেই যে কোন মুহূর্ত্তে আসল ডাচেস বা কাউণ্টেস—অর্থাৎ রাজরাণী হ'তে পারেন। রঙ্গালয়ে সুন্দরীর নয়নবাণ, যোগ্য পাত্রের হৃদয় বিদ্ধ করতে পারলে কত মুকুট কৌলীন্য-গর্ব্ব ভোলে তার অনেক কাহিনী আগেই বলেছি। আরো একটি গল্প শুনুন।

* * *

ফ্রান্সের অন্যতম দার্শনিক, নাট্যকার ও সাহিত্যিক ভল্‌তারের (Francois Marie Arout de Voltaire ১৬৯৪-১৭৭৮) নাম নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে অজানা নেই। এই প্রেম-নাট্যের প্রধান নায়ক হচ্ছেন তিনিই।

* * *

একদিন ভল্‌তার এক চিত্রকরের সামনে ব'সে নিজের ছবি আঁকাচ্ছেন, এমন-সময় একটি তরুণী পরিচয়পত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। উদীয়মান নাট্যকার ভল্‌তার দেখলেন, তরুণীর জামা-কাপড়ের ভিতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে গরিবিয়ানার নীরব কান্না! কিন্তু তার মুখ! কেবল সুশ্রী বললেই তার বর্ণনা করা হয়না। লোহার যদি মন থাকত তাহ'লে সে-মুখ দেখলে তাও গ'লে যেত।

প্রথম দৃষ্টিতেই হৃদয় হারিয়ে ভল্‌তার তরুণীকে সুধোলেন, "কি চাও তুমি?" তরুণী বললে, "আমি থিয়েটারে ঢুকতে চাই।" ভল্‌তার বললেন, "বেশ, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। তুমি থিয়েটারেই ঢুকবে, আর তোমার পৃষ্ঠপোষক হব আমি।"

* * *

তরুণীটির নাম হচ্ছে আরোরা। দুদিন বাদেই দেখা গেল, ভল্‌তার করছেন অরোরার পৃষ্ঠপোষণ এবং অরোরা করছেন ভল্‌তারের চিত্তশোষণ। অরোরার পাশে না থাকলে ভল্‌তারের মুখে হাসি আর ফোটেনা। অরোরা হয়ে উঠল তাঁর চোখের মণি—এমন কি তাঁর এই পূজার প্রতিমার সাম্‌নে ব'সেই ভল্‌তার তাঁর নাটক রচনার প্রেরণা পর্য্যন্ত লাভ করতে লাগলেন।

* * *

কিছুদিন কাট্‌ল স্বপ্নের ভিতর দিয়ে। তার পরেই দেখা গেল আকাশে অন্ধ আঁধি। অরোরা সাবিত্রীর দেশেও জন্মায়নি—এমন কি গণিকা লক্ষহীরার পর্য্যায়েও তার নাম পড়েনা। হঠাৎ একদিন ভল্‌তারের আলিঙ্গনের ভিতর থেকে সে অদৃশ্য হ'ল ভল্‌তারেরই এক বন্ধুর সঙ্গে। যাবার সময়ে ভল্‌তারকে এই মর্ম্মে চিঠি লিখে গেল—তুমি মনে কোরো আমি ম'রে গেছি। তুমি আমার সমাধি-স্তম্ভের জন্যে স্মারকলিপি রচনা কোরো। আর যে-চটিজুতো জোড়া আমি সব-চেয়ে ভালোবাসি তুমি তা আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।

* * *

তারপর কিছুকালের জন্যে অরোরার উদয় দেখলে লণ্ডন সহর। তার

নাম লোকের মুখে মুখে। কিন্তু এক ফুলে মধু খাওয়া মৌমাছির স্বভাব নয়। কাজেই ভল্‌তারের বন্ধুর সৌভাগ্যও দীর্ঘকালস্থায়ী হ'লনা। হঠাৎ একদিন Marquis de Gouvernet নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অরোরার কাছে ফুলের তোড়া ও বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসে হাজির হ'ল। নটী অরোরা হ'ল রাণী।

* * *

রাণী অরোরা আবার পারী সহরে ফিরে এল, সমাজের সেরা রত্নের মত। কিন্তু ভল্‌তারের মন তখনো অরোরার প্রতি বিমুখ হ'তে পারেনি। তার এই অভাবিত সম্মানের জন্যে হৃদয়ের আনন্দ নিবেদন করতে ভল্‌তার একদিন রাণী অরোরার প্রাসাদে এসে হাজির। কিন্তু রাণী তাঁর জমকালো পোষাক পরা দরোয়ানকে হুকুম দিলেন ভল্‌তারকে গলাধাক্কা দিতে।

* * *

তারপর অতীত হ'ল একটি আধটি নয়, পঞ্চাশটি বৎসর। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—"বৎসরে কি কালের মাপ।" এত বৎসরেও ভল্‌তারের প্রেম-প্রদীপের শিখা-পরিম্লান হয়নি। অরোরার যৌবনের উপবনে আর রূপের ফুল ফোটেনা; তার জীবনের সবুজ বসন্ত চ'লে গেছে এবং শীত এসেছে তুষারের মত শুভ্র কেশমালা তার শিয়রে দুলিয়ে। ভল্‌তারও এখন বৃদ্ধ। কিন্তু তাঁর খ্যাতি আজ সারা য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়েছে—দেশ-বিদেশের সম্রাট ও রাজা-রাজড়ারাও আজ তাঁর স্তুতি-গীতা রচনা ক'রে ধন্য হয়। অর্দ্ধশতাব্দী আগে যে-প্রেমাস্পদকে অরোরা দরজা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, আজ সে আবার তাঁকে সাদরে গ্রহণ করতে চাইলে। দুজনে দেখা হ'ল।

একজন বলেছেন, "Love at two-and-twenty is a terribly intoxicating draught; at two-and-eighty it is a soothing night-cap." এবং প্যাস্‌কালের মত হচ্ছে :

"Love has no age, as it is always renewing itself."

* * *

প্রাচীনা অরোরার হাতে একটি চুম্বন-রেখা মুদ্রিত ক'রে দিয়ে ভল্‌তার বললেন, "শ্রীমতী, এ ছাড়া এখন আর কিছুই আমার দেবার নেই। কিন্তু কোনদিনই আমি তোমাকে ভুলিনি।" অরোরাও অভিনয় ভোলেনি। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "হায়! এক ঘণ্টার জন্মেও অতীতের দিন যদি আবার ফিরিয়ে পাই, তবে তার বিনিময়ে আমার সমস্ত জমিদারী, সমস্ত ধনরত্ন, সমস্ত গাড়ী-ঘোড়া আমি বিলিয়ে দিতে পারি!"—কথায় ভল্‌তারও কি হারবার পাত্র? তিনি বললেন, "শ্রীমতী, সেই অর্দ্ধ শতাব্দী আগেকার একটিমাত্র চুম্বনের জন্মে আমার সমস্ত যশ-মান-অমরতা এখনি আমি অকাতরে দান করতে পারি।"

সমাধির সামনে দাঁড়িয়ে এই পূর্ণমিলন! কয়েকদিন পরেই ভল্‌তার অন্তিম শ্বাস ত্যাগ করলেন। এবং তারই ঘণ্টাকয় পরে অরোরারও জীবন-নাট্যের উপরে যবনিকা টেনে দিলেন, মহাকাল।"

বাংলা রঙ্গালয়েও যে 'রোম্যান্স' নেই তা নয়। ললিত কলার সকল ক্ষেত্রেই মদন-ঠাকুরের পদধ্বনি শোনা যায় ঘন ঘন। কিন্তু এখানকার প্রেমের ইতিহাস অপরাধের ইতিহাস এবং তা প্রকাশ করাও মস্ত অপরাধ। অবশ্য তার কারণ অনুমান করা কারুর পক্ষে কঠিন নয়।

সব দেশেরই রঙ্গালয়ের ভিতরে নারীরা সাধারণত হয় লীলাময়ী (ইংরেজী flirt শব্দের এর চেয়ে ভদ্র বাংলা আর পেলুম না)। এবং লীলাময়ী যে পুরুষের কামনাকে সহজে জাগ্রৎ করে সে-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। সেই কারণেই রঙ্গালয়ের মধ্যে পঞ্চশরের প্রভাব-প্রতিপত্তি এত বেশী। অনেক কবি আবার লীলাময়ী-নারীর স্তব করেছেন। Congreveএর এই চার পঙ্‌ক্তিই তার নজীর :—

"False though she be to me and love,
I'll ne'er pursue revenge ;
For still the charmer I approve,
Though I deplore her change."

* * *

লীলা হচ্ছে নারীদের নিজস্ব আনন্দ। বিশেষজ্ঞরা বলেন, অধিকাংশ তরুণীই এই লীলার দ্বারাই করে জীবনকে উপভোগ। একজন লেখক স্পষ্টই বলেছেন "All women flirt, except those unfortunate wretches who can't ; *and they would if they* could." এবং কবি Grey পর্য্যন্ত নারীজাতির এই লীলার কথা এই ভাষায় ব্যক্ত করেছেন :—

"Tis most certain, By their flirting,
Women oft have envy shown ;
Oft undoing, Others' wooing,
Never happy in their own."

* * *

প্রসঙ্গসূত্র ধ'রে এতখানি এগুলুম তো আর একটা দিকও একটুখানি দেখি। আমরা বলি, কেবল নারীকে দুষ্‌লেই চলবেনা। দুনিয়ায় কেবল লীলাময়ী কেন, লীলাময়েরও অভাব নেই। অনেকেরই বোধ হয় জানা নেই যে, বিলাতী সাহিত্যক্ষেত্রে বিখ্যাত, অমন যে গম্ভীর প্রকৃতির ডাঃ জনসন, মনে-প্রাণে ও ব্যবহারে তিনি পর্য্যন্ত বড় কম লীলাময় ছিলেন না—অবশ্য এর কারণ তাঁর নট, নটী ও নাট্যশালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কিনা জানিনা। ডাঃ জনসন তো স্পষ্টাস্পষ্টি স্বীকারই করেছেন যে, "If I had no duties and no reference of futurity, I would spend my life driving briskly in a post chaise with a pretty woman."

এমনকি, বৃদ্ধ বয়সেও পাশে কোন রূপসী না থাকলে তিনি খুসি হ'তেন না। তাঁর বুড়ো-বয়সে একবার এক যুবতী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তিনি কেমন আছেন? জনসন জবাবে বললেন, "শ্রীমতী, তুমি আমার পাশেই রয়েচ, তবু আমার শরীর বড়ই খারাপ,—তাহ'লে ভেবে দেখ দেখি, তুমি যখন কাছে থাকবেনা, তখন আমার অবস্থাটা কি-রকম দাঁড়াবে?

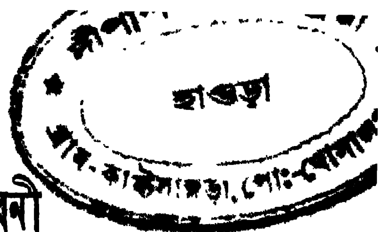
* * *

জনসনের জীবনী-লেখক Boswell, সঙ্গীতবিদ Beethoven, কবি Byron ও Shelley, সাহিত্যিক Swift ও রাজনৈতিক Wilkes (Essay on Woman-এর কুবিখ্যাত লেখক) প্রভৃতিও ছিলেন প্রথম শ্রেণীর লীলাময়। Wilkes জাঁক দেখিয়ে এমন কথাও বলতে ছাড়েননি যে, "ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের ভিতরে আমি তো সব-চেয়ে কুৎসিত লোক? কিন্তু আগে আমাকে পনেরো মিনিট সময় দাও, সবচেয়ে

সুপুরুষের সুমুখ থেকে সব-চেয়ে সুন্দরীর হৃদয় আমি জয় ক'রে আনব।" এবং সত্যই তাঁর এ শক্তি ছিল। বিলাতে এক বিখ্যাত বিশ্রপ বা ধর্ম্ম-যাজকও বড় কম লীলাখেলা করেননি! তিনবার বিবাহের পর তিনি যখন চতুর্থ কুমারীকে ভুলিয়ে বিবাহ করেন, তখন নববধূকে যে আংটিটি উপহার দেন তার উপরে এই দুই পংক্তি লেখা ছিল—

"If I survive
I'll make it five."

অর্থাৎ :——"তোমার পরে যদি আমি বাঁচি,
চারকে তবে করব আমি পাঁচই।"



চিরযৌবনী

এক

নিনন্, নিনন্, নিনন্! বিচিত্র নারী এই নিনন্! কাব্যে, পুরাণে বা ইতিহাসে তাঁর তুলনা নেই! সোজা ভাষায় তাঁকে বারবনিতা ছাড়া কিছুই বলা যায় না। কিন্তু অসাধারণ হ'লে ঘৃণ্য দস্যুও যেমন আলেকজান্দার, চেঙ্গীজ, তৈমুর, নেপোলিয়ন ও হিট্‌লার প্রভৃতি গৌরবজনক ও অমর নাম অর্জ্জন করে, নিননের নামও তেমনি ভাবে করে পৃথিবীর বিস্মিত দৃষ্টি আকর্ষণ! অতুলনীয়া নিনন্!

Sainte Beuve, Rousseau ও Voltaire প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য অমর লেখকের কথা ছেড়ে দি, তাঁরা তো নিননের নাম নিজেদের সৃষ্ট সাহিত্যে চিরস্মরণীয় ক'রে গিয়েছেন; কিন্তু নিনন্‌কে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন নি, সতেরো শতাব্দীর ফ্রান্স দেশে এমন লেখক, কবি, শিল্পী বা সাংবাদিক বোধ হয় ছিলেন না। ফ্রান্সের রাজপ্রাসাদ থেকে জীর্ণ পর্ণ-কুটিরে—সর্ব্বত্রই উঠত নিননের জয়জয়কার! দেহের ও মনের সৌন্দর্য্যের জয়জয়কার! এমন কি ধর্ম্মাচার্য্য ও সাধ্বী নারীরা পর্য্যন্ত নিননের বন্ধুত্বকে অবহেলা করতে পারতেন না।

নিনন্‌কে নিয়ে এত আলোচনা হ'ত যে Voltaire বলেছেন—"এই ধারা যদি আরো কিছুকাল চলে, তাহ'লে শীঘ্রই নিননের ইতিহাস হয়ে উঠবে রাজা চতুর্দ্দশলুইয়ের ইতিহাসের মতনই প্রকাণ্ড!"

Rousseau বলেছেন—"অসতী নারীরা সব পাপ করতে পারে। কেবলমাত্র নিনন্ আছেন এই দলের বাইরে। তিনি হচ্ছেন অলোক-

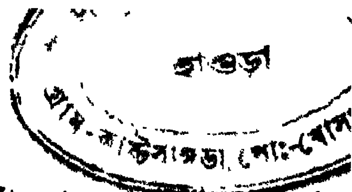
সামান্যা।' তিনি সতীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করেন না, কিন্তু লোকে বলে—তাঁর প্রভাবে নাকি আমরা হয়ে উঠি সৎ!"

Versailles রাজপ্রাসাদে আজও নিননের প্রতিকৃতি সযত্নে টাঙানো আছে। ছবিখানি দেখলে বোঝা যায়, সে মূর্ত্তি মনোরম হ'তে পারে, কিন্তু পরমসুন্দর নয়। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন তাঁরাও বলেন, নিননের দেহ প্রেমিককে খুসি করতে পারলেও রূপের চেয়ে তাঁর প্রকৃতিই করত বেশী মোহমায়ার সৃষ্টি। কেবল চোখের দেখা দেখেই ক্ষান্ত হ'লে অধিকাংশ পুরুষই তাঁর পায়ে দাসখৎ লিখে দিতে চাইত না। কিন্তু একবার যে তাঁর সংস্পর্শে এসেছে এবং তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছে, হৃদয় সমর্পণ না ক'রে আর সে ফিরতে পারে নি।

ইতিহাস বলে, মিসরের রাণী ক্লিয়োপেট্রাও সুন্দরী ছিলেন না। কিন্তু সীজার ও মার্ক আণ্টনীর মতন মহাবীর ও পুরুষশ্রেষ্ঠও বাধ্য হয়েছিলেন তাঁর কবলে আত্মসমর্পণ করতে। তাই তো বাংলার কবি গেয়েছেন —"সুধু রূপে কি করে?"

কিন্তু নিননের কেশমালা ছিল চেষ্টনাট্ ফলের মতন সুন্দর কপিশবর্ণ, গায়ের রং ছিল জলন্ত, ওষ্ঠাধর ছিল রক্তের মত আরক্ত, কপোল দুটি টোল খেয়ে সুমধুর এবং দুটি কালো চোখ স্বচ্ছ, আগুন-ভরা ও হাসি-রঙিন! এবং তাঁর সর্ব্বাঙ্গের উপর দিয়ে সর্ব্বদা বয়ে যেত উৎফুল্ল জীবনের চঞ্চল প্রবাহ!

এইবার নিননের জীবনের একটি ছোট্ট রেখাচিত্র দেবার চেষ্টা করব।



দুই

নিনন্ হচ্ছে আদরের ডাক নাম। তাঁর আসল নাম Mlle. Ann de L' Enclos.

১৬১৬ খৃষ্টাব্দে ১৫ই মে তারিখে পারী সহরে তাঁর জন্ম! তাঁর পিতা ছিলেন ভদ্রসন্তান,: দ্বৈরথযুদ্ধে ওস্তাদ, চক্রী, সঙ্গীতবিদ্ এবং লম্পট। তাঁর মা ছিলেন সাধারণ গৃহস্থ নারীর মত, কল্পনা বা কাব্যরসের কোন ধারই ধারতেন না। পনেরো বছর বয়সে নিনন্ হন পিতৃমাতৃ-হারা।

নিনন্ স্বাধীন হলেন, অসহায় হলেন না। তাঁর ছিল সুশিক্ষা, সুরুচি ও দুঃসাহস এবং অবাধ জীবনকে গ্রহণ করবার দুর্জ্জয় শক্তি।

ফ্রান্সে তখন সন্দেহবাদ ও এপিকিউরিয়ানের মতবাদ অত্যন্ত জনপ্রিয়। 'মৃত্যুই হচ্ছে চিরনিদ্রা, অতএব জীবনের আনন্দ প্রাণপণে লুণ্ঠন করে নাও।' সাহিত্যে ও সমাজে এ ছাড়া কথা ছিল না।

"নারীর সতীত্ব হচ্ছে পুরুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাল্পনিক উদ্ভাবনা।" এই উক্তি আধুনিক হ'লেও নিনন্ মনে-প্রাণে মানতেন। পুরুষ ও নারীর চরিত্রের মাপকাঠি হবে ভিন্ন-রকম, এটা তিনি স্বীকার করতেন না।

সম্ভোগের স্রোতে গা ভাসান্ দিয়ে নিনন্ প্রথমটা এমন আত্মহারা হয়ে পড়লেন যে দেশের রাণীরও টনক নড়ল! তিনি নিনন্‌কে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। কিন্তু ফ্রান্সের এক বিখ্যাত রাজকুমার (Prince de Conde) ছিলেন নিননের পুরাতন প্রেমিক। কাজেই শাস্তি দেওয়া সম্ভবপর হ'ল না।

নিনন্‌ও নিজেকে সামলে নিলেন। চল্‌তি পথ ছাড়লেন না বটে, কিন্তু নিজের উদ্দামতাকে করলেন সংযত এবং আনন্দকে করলেন নিয়মিত।

দেশের যত সম্রান্ত এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন নিননের প্রেমিক। এবং নিননের শক্তি ও যাদুমন্ত্র ছিল এমনি আশ্চর্য্য যে সকলেই একসঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বকে স্বীকার ক'রে নিলেন। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যে কোন রেষারেষি আছে, অন্তত বাইরে কেউ এমন ভাব প্রকাশ করতে পারতেন না। বাঘ ও সিংহকে একসঙ্গে কেমন ক'রে পালন করতে হয়, নিননের কাছে সেটা অজানা ছিল না।

নিননের বাড়ীতে গেলে কারুর ভদ্রতায় আঘাত লাগবার বা সম্ভ্রমহানি হবার সম্ভাবনা ছিল না। বরং তখনকার ফ্রান্সের বহুনিন্দিত সম্রান্ত সমাজে প্রচলিত কোন কুরীতিই নিননের আসরে প্রবেশ করবার পথ পেত না।

সেখানে ছিলনা হট্টগোল, অট্টহাসি, ঝগড়া-ঝাঁটি, জুয়াখেলা, রাজনীতি বা ধর্ম্মনীতি নিয়ে তর্কাতর্কি।

নিননের স্বভাবিক সজীবতা ছিল এমন উজ্জ্বল যে সাদা জল পান ক'রেই তাঁর নেশা ও স্ফূর্ত্তি যেন জ'মে উঠত। কোনদিন তিনি মদ ছোঁন নি, মাতালকেও হাসিমুখে গ্রহণ করতে পারতেন না।

তাঁর কথা বলবার ও গল্প বলবার শক্তি ছিল অদ্ভুত! প্রত্যেক কথাটি ছিল রসে ভরা। শিক্ষার প্রসার ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাও ছিল অসাধারণ। জলন্ত কামনায় নন—তিনি ছিলেন এমন উচ্চ মনীষার প্রতিমূর্ত্তি যে, Rousseau সন্দেহ প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন, এ-শ্রেণীর নারীকে চিত্তাকর্ষক উপপত্নীরূপে গ্রহণ করা সম্ভবপর কিনা!

কিন্তু নিনন্ কেবল মনীষার জন্যে সুবিখ্যাত ছিলেম না, বারবিলাসিনী রূপেও তিনি ছিলেন কুবিখ্যাত।

নানা সৎগুণের জন্যে ভক্তেরা নিননের মধ্যে এমন দেহাতীত সৌন্দর্য্যের

সন্ধান পেতেন যে, বয়সের ভারে তাঁর রূপ কোনদিন লুপ্ত হয়ে যায় নি। দেহ নিয়ে যারা ব্যবসা করে, যৌবন-সীমা পেরিয়েই তারা হয় সর্ব্বস্বান্ত। গণিকা-জীবনের এই চিরন্তন ট্রাজেডি প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য্যে অমর হয়ে আছে।

কিন্তু একমাত্র নিনন্ সম্বন্ধেই বলা যায়, তিনি কোনদিন যৌবন হারান নি। তাঁর যৌবন ছিল জরার বন্ধ।

নিনন্ পঞ্চাশ পার হলেন, ষাট পার হলেন, সত্তর পার হলেন—কিন্তু তাঁর আসরে সম্ভ্রান্ত ও যুবক প্রণয়ীর অভাব নেই।

নিনন্ আশী পার হলেন। কিন্তু তখনো তাঁর বাড়ীতে জনতা। নিননের বয়স নব্বই বৎসর। কিন্তু তখনো বড় বড় ঘরের লোকেরা তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে উন্মুখ! ভাবছেন রূপকথা? না সত্যকথা!

সারা ফ্রান্সে র'টে গেল, নিনন্ চিরযৌবনের গুপ্ত ঔষধ আবিষ্কার করেছেন। ঔষধের নাম জানবার জন্যে সকলের আগ্রহের সীমা নেই।

কিশোর ভল্‌তার। বয়স তেরো বৎসর মাত্র। কবিতায় হাত পাকাচ্ছেন। তাঁর ধর্ম্মপিতা এক ধর্ম্মযাজক।

ধর্ম্মপিতা একদিন ধর্ম্মপুত্রকে নিয়ে নিননের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে গেলেন। পৃথিবীর অঙ্কের হিসাবে নিনন্ তখন বৃদ্ধা—অতিবৃদ্ধা।

কিন্তু নিননের দেহের বা মনের দৃষ্টি ঝাপসা হয়নি তখনো। লোক চেনবার ক্ষমতা তিনি হারান নি। বালক ভল্‌তারের সঙ্গে অল্পক্ষণ আলাপ ক'রেই বুঝলেন, এ হচ্ছে ভ[illegible]প্রতিভার বীজ!

প্রায় শতাব্দীকাল পৃথিবীর আলোক-বাতাস গ্রহণ করে চিরযৌবনী নিনন্ নিলেন মানুষের কাছ থেকে চিরবিদায়। তখন তাঁর উইল খুলে

দেখা গেল ভলতারকে তিনি দুই হাজার ফ্রাঙ্ক দান ক'রে গিয়েছেন। বিলাসের সামগ্রী কেনবার জন্যে নয়, বই কেনবার জন্যে।

তিন

বিখ্যাত পুস্তক Gil Blas-এ নিননকে ছদ্মনামে পরিচিত করে একটি কাহিনী বলা হয়েছে। আমরা আসল নামই ব্যবহার করলুম।

প্রাচীনা নিনন্—চিরতরুণী নিনন্। তাঁর চারিদিক ঘিরে অতীতের যশোসৌরভ। বর্ত্তমানও গাইছে তাঁর প্রশস্তি-গান। মহাকাল হরণ করেছে তাঁর যৌবনকাল, কিন্তু তখনো তাঁর ফুটন্ত তনুকুসুমের মনমাতানো সুগন্ধ কেড়ে নিতে পারেনি।

ভ্যালেরিয়ো নব্য যুবক। বয়স তার পঁচিশ বৎসর। নিননের প্রেমে সে পাগল।

সে নিননের পিছনে পিছনে ঘুরতে লাগল ছায়ার মত। সুযোগ পেলেই নিজের প্রাণের উচ্ছ্বসিত আবেদন জানাতে ভোলে না। তার আবেগ, তার উদ্দামতা দেখে নিনন্ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

অবশেষে তার উত্তাপ ঠাণ্ডা ও উৎপাত বন্ধ করবার জন্যে নিনন্ এক উপায় অবলম্বন করলেন।

নিননের আহ্বানে ভ্যালেরিয়ো একদিন তাঁর শয়নগৃহে প্রবেশ করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করলে। প্রাণে তার আনন্দ ধরে না। ভাবলে, এতদিনের বাসনা আজ চরিতার্থ হবে।

টেবিলের উপরে একটি ঘড়ী। সেইদিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ ক'রে নিনন্ বললেন, "প্রিয় ভ্যালেরিয়ো, ঘড়ীতে ক'টা বাজ্‌ল দেখছ?"

—"দেখছি।"

—"ঠিক এই সময়টিতে আমি প্রথম এসেছি পৃথিবীতে। সে আজ পঁচাত্তর বৎসর আগেকার কথা। এখন তুমিই বল দেখি, এ বয়সে আমার পক্ষে আর কি প্রণয়চক্রান্ত শোভা পায়? বাছা, কুৎসিত ইচ্ছা দমন কর, এ-ব্যাপারটা কারুর পক্ষেই মানানসই নয়।"

তবু ভ্যালেরিয়ো নাছোড়বান্দা! সে তখন উন্মত্ত, যুক্তির মানা মানে না। আবেগরুদ্ধ স্বরে বললে, "নিষ্ঠুর নিনন্, কেন তুমি এমন নিষ্ফল কথা বলছ? কেন তুমি ভাবছ যে, এই কথা শুনে আমি তোমাকে ভুলব? অসম্ভব! আমি তোমাকে যেমন দেখছি তুমি ঠিক তাই, কিংবা কোন যাদুমন্ত্রে আমার চোখ ভ্রান্ত হয়েছে, একথা আমি জানি না—জানতেও চাই না! কিন্তু আমি তোমাকে ভালো না বেসে পারব না! ভালোবাসব—চিরদিন তোমায় ভালোবাসব!"

নিনন্ গম্ভীরভাবে বললেন, "তাই নাকি? তাহলে শোনো ভ্যালেরিয়ো আজ থেকে আর আমি তোমার মুখ দেখব না। আজ তোমার সামনে আমার বাড়ীর দরজা হ'ল বন্ধ।"

কিন্তু তুচ্ছ দ্বার বা দ্বারবান ভ্যালেরিয়োর দুর্দান্ত প্রেমকে বাধা দিতে পারলে না। প্রেম তার কড়া মদের মত। সে উদ্দাম হয়ে উঠল অধিকতর। প্রত্যাখ্যাত হবার পরেও কাকুতি-মিনতির দ্বারা নিনন্‌কে বশীভূত করবার ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়তে পারলে না।

তারপর সে মরিয়া হয়ে উঠল একেবারে। একদিন বেপরোয়ার মত নিননের সামনে গিয়ে বললে, "এতদিন অনুনয়-বিনয়ের দ্বারা যা লাভ করতে পারলুম না, আজ বাহুবলের দ্বারা তাই আদায় করতে এসেছি। আজ আর তোমার মুক্তি নেই!" তারপরই আক্রমণের চেষ্টা।

নিনন্ তাকে বাধা দিয়ে বিকৃতকণ্ঠে বললেন, "ধৃষ্ট যুবক, ক্ষান্ত হও।

আর কোন কথা লুকবো না। কাকে তুমি আক্রমণ করতে চাও? আমি তোমারি গর্ভধারিণী মা!"

ভ্যালেরিয়ো স্তম্ভিত। তারপর মাথা নেড়ে বললে, "আমি বিশ্বাস করি না।"

নিনন্ বললেন, "শোনো। ছাব্বিশ বছর আগে পেড্রে ডি লুনার—অর্থাৎ তোমার পিতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। তারই ফলে তোমার জন্ম। ভেবেছিলুম এ কথা আর কেউ জানবে না, কিন্তু তোমার অত্যাচারে আজ বাধ্য হয়েই আমাকে গুপ্তকথা প্রকাশ করতে হ'ল। এর পরেও আমাকে যদি মা ব'লে ভাবতে না পারো, তাহ'লে এখনি চিরকালের জন্যে বিদায় হও।" হতভাগ্য যুবক চিরকালের জন্যেই বিদায় হ'ল। বাড়ীতে ফিরে ভ্যালেরিয়ো করলে আত্মহত্যা।

মেরিকোর্ট

বারাঙ্গনা ব'লতে আমরা সবাই বুঝি, কামাগ্নি নির্ব্বাপিত বা দ্বিগুণ প্রজ্বলিত ক'রতে পারে এমন কোন জীবন্ত যন্ত্র।

কিন্তু বারাঙ্গনার মধ্যে যে মানুষের প্রাণ আছে, সে-প্রাণ কি জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে আর কোন কাজে লাগতে পারে না ?

মেরিকোর্ট নামে একটি মেয়ের কথাই বলি। ইতিহাসে La Belle Liegeoise নামে সে অমর হয়ে আছে। সে এক সম্পন্ন গৃহস্থের মেয়ে। সম্ভ্রান্ত বংশের কোন যুবক তাকে ভুলিয়ে ঘর থেকে পথে বার ক'রে আনে। তারপর এ-সব ক্ষেত্রে যা হয়, তাইই হ'ল। সে যাঁকে ভেবেছিল রূপকথার রাজকুমার, একদিন দুঃস্বপ্নের মতই তিনি হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন কোথায় কে জানে ?

কিন্তু মেরিকোর্ট ভীতু মেয়ে নয়—জীবন-সাগরের উত্তাল তরঙ্গ দেখে সে শিউরে উঠল না, তার ভিতরে নিজের তরুণ তনুর তরণী ভাসিয়ে দিলে হাসিমুখেই, অনায়াসে। তার তনু-তরণীর কত কর্ণধার এল—কত কর্ণধার গেল!

এ-শ্রেণীর নারীদের জীবন এই ভাবেই একটা নির্দ্দিষ্ট, অসহায় পরিণামের দিকে এগিয়ে যায় এবং তার মধ্যে বৈচিত্র্য ও আনন্দ খুঁজে পায় কেবল শ্রেণীবিশেষের মানুষরাই!

কিন্তু মেরিকোর্টের জীবনের ভিতরে নতুন কোন আগুনের স্ফুলিঙ্গ

লুকিয়ে ছিল। তাই একটা মস্ত জাতির কথা বলতে ব'সেও Carlyle, Michelet ও Lamartineএর মতন বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিকরা পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্র ফরাসী গণিকাকে অবহেলা করতে পারেন নি। তাঁদের লিখিত ইতিহাসেই মেরিকোর্টের যথার্থ পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে।

মেরিকোর্টের যথার্থ রূপ আমরা প্রথম দেখতে পাই ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে, যখন জনসাধারণের প্রাণরক্ষা করবার জন্যে সে আক্রমণোদ্যত ফ্লাণ্ডার্স রেজিমেণ্টের বন্দুকধারী সৈন্যদের পায়ের তলায় প'ড়ে নিজের বুক পেতে দিয়েছিল!

ফরাসী বিপ্লবের সময়ে তার নাম ও বীরত্বের কাহিনী ফিরত লোকের মুখে মুখে। কুম্ভকর্ণের মতন ঘুমন্ত প্রজাশক্তি ফরাসী দেশে যেদিন প্রথম জাগ্রত হয় সেইদিন থেকে মেরিকোর্টকে সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই দেখা যেত বিপ্লবের মানস প্রতিমার মত! সে সময়ে মেরিকোর্টের বুভুক্ষু অগ্নিশিখার মতন মূর্ত্তি তার-অতি বড় দেহের পূজারীরও হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ত! কারণ তখন তার দেহে নারীত্বের কোন চিহ্নই আত্মপ্রকাশ করত না!··· রক্তের মতন রাঙা পুরুষের পোষাক প'রে, কোমরবন্ধে দু-দুটো পিস্তল গুঁজে বিপ্লবের বিপুল শোভাযাত্রার সঙ্গে বিকট স্বরে চীৎকার করতে করতে সে যখন ছুটে চলত, তখন কেউ তার সামনে এসে দাঁড়াবার ভরসা করত না।

যারা বাস্তিলের বিখ্যাত কারগার ধ্বংস করেছিল, তাদের সর্ব্বপ্রথম দলের সঙ্গে ছিল এই অপূর্ব্ব শক্তিরূপিণী গণিকা মেরিকোর্ট! এখানে আশ্চর্য্য সাহসের পরিচয় দিয়ে সে সম্মানজনক এক সরকারী উপহার লাভ করেছিল। পারী সহরের পথে পথে যখন রক্তের বন্যা বইছে, তখন

রাজশক্তির বিরুদ্ধে নারি-বাহিনী চালনা করবার ভার পেয়েছিল মেরিকোর্টই। রাজা যখন দেশ ছেড়ে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েন, তখন অন্যান্য বিপ্লববাদীদের সঙ্গে অশ্বারোহণে সেও রাজাকে বন্দী করে রাজধানীতে ফিরিয়ে এনেছিল! রাজ সৈন্যদের অসংখ্য ছিন্নমুণ্ড বর্শার ফলায় বিঁধে যারা বীভৎস আনন্দে সহর তোলপাড় ক'রে বেড়িয়েছিল, নারী হয়েও মেরিকোর্ট তাদের সঙ্গে সমান উৎসাহে যোগ দিতে সঙ্কুচিত হয় নি! তার উত্তেজনাপূর্ণ ভীষণ বক্তৃতা বিপ্লববাদী পুরুষগণকেও আরো-বেশী রক্তপাগল ক'রে তুলত। বিপ্লববাদীদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাবে নিজের দৃষ্টান্তে অন্যান্য নারীদের উৎসাহিত করবার জন্যে মেরিকোর্ট তার গায়ের সমস্ত দামি গহনা খুলে দান করেছিল। সে-সময় জনসাধারণের উপরে তার জোর ছিল এত বেশী যে, তার একটি মুখের কথা'র উপরে লোকের মরণ-বাঁচন নির্ভর করত! একবার সে অষ্ট্রিয়ানদের হাতে বন্দী হয়ে ভিয়েনায় গিয়েছিল এবং তাই শুনে অষ্ট্রীয়ার সম্রাট পর্য্যন্ত কৌতূহলী হয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। এই বিষয় নিয়ে তাকে প্রধানা পাত্রী ক'রে ১৯০২ অব্দে একখানি বিখ্যাত নাটক লেখা হয় এবং সেই নাটকের অভিনয়ে মেরিকোর্টের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন পৃথিবী-প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী সারা বার্ণার্ড স্বয়ং।

বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে মেরিকোর্টেরও রক্ত-পিপাসা যেন বেড়ে উঠল! তখন কোথায় গেল তার দেহের ব্যবসা এবং কোথায় রইল তার পরপুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার প্রবৃত্তি! বিপ্লবের উন্মাদনা ছাড়া এক মুহূর্ত্তও সে স্থির থাকতে পারত না। তার প্রাণের ইচ্ছা ছিল, এই রক্তাক্ত বিপ্লব চিরস্থায়ী হোক্।

কিন্তু ফরাসী বিপ্লব তার মতন আরো অনেক নারীর জন্ম দিয়েছিল। ইতিহাসে তারা "গিলোটিনের রায়বাঘিনী" বা "furies of the guillotine" নামে বিখ্যাত। তাদের মুখের বুলি ছিল—"রক্ত—আরো রক্ত চাই!" খুব সম্ভব সারা দেশে মেরিকোর্টের এই প্রতিষ্ঠা তাদের আর সহ্য হ'ল না। একদিন তারা দল বেঁধে প্রকাশ্য রাজপথে মেরিকের্টাকে ধ'রে, তাকে উলঙ্গ ক'রে তার সর্ব্বাঙ্গে নিষ্ঠুর ভাবে বেত্রাঘাত করলে।

এ অপমান মোরিকোট সইতে পারলে না! বেত্রাঘাতের পরে পথের কাদা থেকে মেরিকোর্টকে তুলেই দেখা গেল, তার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে!

এর পর পাগ্‌লা-গারদের ভিতরে মেরিকোর্ট বেঁচে ছিল বিশ বছর। পূর্ব্বোক্ত নিদারুণ অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে এই দীর্ঘ বিশ বৎসর সে আর জামা-কাপড় পরে নি!

নিজের নগ্ন দেহকে গরাদের কাছে টেনে এনে, মাথার উস্কখুস্ক সাদা চুল দুলিয়ে, দু'খানা শুক্‌নো শীর্ণ হাতে গরাদে চেপে ধ'রে প্রায়ই সে এক কাল্পনিক জনতাকে সম্বোধন ক'বে চেঁচিয়ে উঠত, "রক্ত চাই—বিশ্বাস-ঘাতকের রক্ত!"

গণিকা মেরিকোর্ট! কিন্তু সে খালি সাহিত্যে ও ইতিহাসেই স্থান পায় নি, ফরাসী জাতিও তাকে অযাচিত অভিনন্দন দেয়। তারা প্রায়ই গণিকা মেরিকোর্টের নামেই নিজেদেব বালিকা-বিদ্যালয়ের নাম রাখে!



শিল্পী-চরিত্রের একদিক

ফরাসী কবি Rimbaud বলছেন :—

"I say that one must become a Seer, make oneself a visionary. The poet becomes a Seer by a vast, prolonged and reasaurd derangement of all the senses.

The poet exhausts every form of experience from love to madness, and though the torment is great and social outlawry must result, he becomes finally the repository of the supreme wisdom :

For he reaches the Unknown ! Since he has cultivated his soul, richer to begin with than any other. And even if, maddened, he should end by losing consciousness of his visions, he has seen them ! Though he collapse in his wild career among unheard-of and unnameable things, other horrible workers will come forward and they will set out from the horrizon where the other sank down."

আমি কবি বলতে শিল্পীকেও ধরতে চাই। অধিকাংশ কবি বা শিল্পীর মনেই যে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে ঐ রকম ভাবের উদয় হয়েছে, বহু প্রমাণ দেখে এমন সন্দেহ প্রকাশ করলে অন্যায় হবেনা।

ফ্রান্সে ভিলন, ভ্যারলেন, বোদল্যার, মুসে ও মোপাসাঁ প্রভৃতি লেখকগণ রীতিমত নরকে ঝাঁপ দিতেও কুণ্ঠিত হন নি। ইংলণ্ডের অস্কার ওয়াইল্ডকেও আমরা এই দলে নিক্ষেপ করতে পারি।

এবং হিসাব করলে দেখা যাবে, পৃথিবীর অধিকাংশ শিল্পীই একেবারে নরকস্থ না হয়েও দুষ্ট বা বিকৃত বা অবৈধ প্রেমের জন্যে অল্পবিস্তর পরিমাণে কুবিখ্যাত হয়ে আছেন। যেমন প্রাক্সিতেলেস, মিকেলাঞ্জেলো, সেলিনি, দ্য ভিঞ্চি, গেটে, হাইনে, সেক্সপিয়ার, বাইরণ, য়ুগো, দুমা, সুইন্‌বার্ণ, জোলা রুসো, জর্জ্জ ইলিয়ট ও দান্নুনসিয়ো প্রভৃতি—কত আর নাম, করব?

ঋষি টলষ্টয় পর্য্যন্ত এক সময়ে তপোবনে বাস করতেন না। 'পিউরিটান' বা উৎকট পবিত্রতাবাদী মিলটনকেও যৌবনে আমরা গণিকা-গৃহে কবিতা পাঠ করতে দেখেছি! ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থও ছিলেন অবৈধ সন্তানের জনক! বিখ্যাত গণিকা আডা মেন্‌কেনের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে চাল্‌স্ ডিকেন্স ও চার্লস রীড লজ্জার মাথা খেতেও সঙ্কুচিত হননি।

বোহিমিয়া নামে পুরানো দেশটি আজ জেকো-শ্লোভাকিয়ার অন্তর্গত। সেকালে ঐ বোহিমিয়া দেশে অনেক "জিপ্‌সি" বা বেদে বাস করত। সবাই জানেন, সামাজিক জীব বলতে আমরা যা বুঝি, বেদেরা সে-শ্রেণীর মানুষ নয়। তারা যাযাবর, পৃথিবীর নানা দেশে তারা ভ্রমণ করে এবং তাদের মধ্যে আমাদের মতন সমাজ-বন্ধন নেই। বেদে-জীবনের এই অবাধ স্বাধীনতা য়ুরোপের লেখকদের দৃষ্টি করেছিল বিশেষভাবে আকৃষ্ট। য়ুরোপীয় সাহিত্যে তাই বেদে-জীবন নিয়ে রচিত মেলো-ড্রামা, গীতিনাট্য ও রোমান্সের সংখ্যা গুণে ওঠা যায় না।

এই-সব রোমান্স ও মেলো-ড্রামায় অত্যুক্তিপূর্ণ উজ্জ্বল বর্ণনায় বেদে-জীবনকে এমন অবাস্তব ভাবে ও লোভনীয় রূপে দেখানো হয়েছে যে, যারা দুর্নীতিপূর্ণ সমাজ-ছাড়া জীবন যাপন করেতে চাইত, তাদের কাছে বেদেরা হয়ে উঠল আদর্শ মানুষ। ফ্রান্সে এই রকম উচ্ছৃঙ্খল মানুষদের bohemien ব'লে ডাকা হ'ত। এই মানুষগুলিই আধুনিক সাহিত্যিক বোহিমিয়ানদের অগ্রদূত। শিল্পীর পৃথিবীতে আজ এই নকল বোহিমিয়ানদেরই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বেদে জীবনের ভিতর থেকে যে অপ্রকৃত রোমান্স স্বপ্নবিলাসী লেখকেরা আবিষ্কার করেছেন, আদি ও অকৃত্রিম বোহিমিয়ানরা—অর্থাৎ বেদেরা নিজেরাও তার সঙ্গে পরিচিত নয়। প্রাচীন ও আধুনিক যুগের উচ্ছৃঙ্খল শিল্পীদের মধ্যে পার্থক্য আছে কেবল এক জায়গায়। সেকালে কেউ "বোহিমিয়ান" ব'লে আত্ম-পরিচয় দিত না।

পারী সহরের "লাটিন কোয়ার্টার" বা বোহিমিয়ার অস্তিত্ব বোধ হয় আর নেই। কিন্তু আগে ওখান থেকে ফ্রান্সের তথা পৃথিবীর বহুবিখ্যাত শিল্পী আত্মপ্রকাশ করেছেন। দুর্ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তাঁরা করতেন বোহিমিয়ান জীবন যাপন। বোহিমিয়ার ব্যভিচার আর অত্যাচারের ফলে অনেকের দেহও একেবারে ভেঙে গিয়েছে—যেমন গল্পলেখক মোপাসাঁ।

উনবিংশ শতাব্দীর নবীন ফরাসী লেখকরা বেলা না পড়তেই একটি কফিখানায় গিয়ে হাজির হতেন—সে জায়গাটি মারাত্মক অখাদ্য ও সুতীব্র সুরার জন্যে ছিল অত্যন্ত কুবিখ্যাত। সময়ে সময়ে জোলা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লেখকরাও তাঁদের দলে গিয়ে ভিড়তেন। সেখান

থেকেই সবাই নেশার ঘোরে বেরিয়ে প'ড়ে হট্টগোল করতে করতে মোপাসাঁর বাসায় গিয়ে হাজির হতেন।

মোপাসাঁর এই অদ্ভুত বাসাটি উল্লেখযোগ্য। এ বাসায় ঘর ছিল অনেকগুলো। পুরুষ-ভাড়াটিয়া ছিলেন মাত্র একজন এবং তিনি হচ্ছেন মোপাসাঁ। বাকী সবাই নিম্নশ্রেণার গণিকা! (একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রকাশ্যে এমন জায়গায় বাস করলেও ফরাসী-সমাজের নীতিবোধ আহত হ'ত না, এটুকুও লক্ষ্য করবার বিষয়!) জোলার মত বয়স্ক লেখক যতক্ষণ সেখানে থাকতেন, নবীন সাহিত্যিকরা ততক্ষণ প্রাণপণে কিঞ্চিৎ ব্রহ্মচর্য্য পালন করতেন। বয়স্করা অদৃশ্য হ'লেই ঘরের ভিতরে এসে দেখা দিতেন বাসার সুলভ, রং-পাউডার-মাখা ডানা-কাটা পরীর দল এবং সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হ'ত ঝটাপটি, হুড়োহুড়ি মাতামাতি। গলা ফাটত, বোতল ভাঙত, গেলাস গুঁড়ো হ'ত, ফুর্ত্তির ফোয়ারা ছুটত।

মোপাসাঁর পক্ষে এই বোহিমিয়ান জীবনের ফল হয়েছিল ভয়াবহ। মাত্র বারো বৎসরের মধ্যেই তাঁর প্রকৃত সাহিত্য-জীবনের আরম্ভ ও সমাপ্তি! তারপরে প্রায় যৌবনেই পাগলা-গারদে গিয়ে তিনি অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এমনি উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন ক'রে বাইরণ, ভ্যার্‌লেন, মুসে ও বোদ্‌ল্যারও অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাঙালী কবি মাইকেল মধুসূদন সম্বন্ধেও এই কথা বলা যায়। (প্রসঙ্গসূত্রে উল্লেখ করছি, আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্রও বিশেষ শান্তশিষ্ট ছেলে ছিলেন না। এবং নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ও ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র তো প্রথম জীবনে ছিলেন পুরোদস্তুর বোহিমিয়ান!)

সাধারণত বোহিমিয়ার আনন্দই হচ্ছে অবাস্তব, কিন্তু তার ট্রাজেডি মিথ্যা নয়! অধিকাংশ বোহিমিয়ান মুখের হাসিখুশি দিয়ে আন্তরিক হাহাকার লুকোবার চেষ্টা করে। অমর ঔপন্যাসিক জোলা প্রথম জীবনে কিছুকাল বোহিমিয়ার অন্ধকূপে বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তখন তাঁর উদর থাকত অধিকাংশ দিনই উপুড়-করা থ'লের মতন খালি। তবু তিনি বিপুল উৎসাহে কবিতার পর কবিতা লিখে যেতেন। কোনদিন জামা-কাপড় বাঁধা দিয়ে, কোনদিন দু-চার পয়সা ধার ক'রে উদরের শূন্যতা নিবারণ করা হ'ত। যখন ধার দিতে পারে এমন বন্ধুর এবং বাঁধা দেওয়া যায় এমন জামা-কাপড়ের অভাব, জোলা তখন ছাদের উপরে ব'সে ফাঁদ পেতে চড়াই পাখী ধরতেন। এবং সেদিন চড়াই পাখীর 'রোষ্ট' খেয়েই কবিতা রচনায় নিযুক্ত হতেন। অন্ন-সমস্যা নিবারণের কি চমৎকার উপায়! বাংলার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কবিদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করছি!

কিন্তু এমন অবস্থায় বোহিমিয়ান হওয়া ছাড়া উপায় নেই। অতএব জোলাও বোহিমিয়ানদের উপযোগী একখানি ঘর ভাড়া নিলেন। ঘরের পর ঘর—কোন ঘরে বখাটে ছাত্র, কোন ঘরে গণিকা, কোন ঘরে বোহিমিয়ান শিল্পী! প্রত্যেক ঘরের মাঝখানে নিতান্ত পাৎলা 'পার্টিশান্' এবং নিজের ঘরে ব'সে জোলা শুনতে পাচ্ছেন, এক ঘরে চলছে প্রেমের পালা বা ফুর্ত্তির হট্টগোল—বোতল খোলা বা বোতল ভাঙা হচ্ছে; আর এক ঘরে হয়তো কোন অসুস্থ গণিকা রোগের যাতনায় বিষম আর্ত্তনাদ করছে; আর এক ঘর থেকে আসছে আনন্দের দীর্ঘশ্বাস, আদরের ভাষা ও চুম্বনের শব্দ! মাঝে মাঝে ভীষণ গোলমালে ঘুম ভেঙে যায়, গণিকারা

বিষম চেঁচিয়ে কাঁদতে থাকে—পুলিস এসে হানা দিয়েছে তাদের কারুকে কারুকে ধ'রে নিয়ে যাবার জন্যে!

জোলার ভাগ্যেও এই জাতীয় একটি নারী-রত্ন জুটতে দেরি হ'লনা—বোহিমিয়ান্ কি একলা থাকতে পারে? এই সময়কার ঘটনা জোলা তাঁর "Confessions of Claude" নামক আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে লিপিবদ্ধ ক'রে বলেছেন—"হায়, সেই অঘটনই ঘটল! আমি ব্যভিচারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলুম! আমার যৌবনকে বিপথগামী করলুম!"

জোলার দুর্ভাগ্যের মধ্য থেকেই যেন কলঙ্কিনী প্রণয়িনী আত্মপ্রকাশ করলে! মাসের পর মাস তিনি তার সঙ্গে এক শয্যায় কাল কাটাতে লাগলেন, হয়তো তাকে ভালোও বাসলেন। কবিতা লেখা ও দিবাস্বপ্ন দেখার উপরে তাঁর আর একটি বিলাসিতা হ'ল এই কাম বা প্রেম। কিন্তু তাঁর উদরের অবস্থা হয়ে উঠল আরো শোচনীয়। দুনিয়ায় তিনি একা। ধার দেয়, এমন আর কোন বন্ধুও নেই। ভিক্ষুকদেরও অবস্থা তাঁর চেয়ে উন্নত, কারণ তাদের ভিক্ষা করবার সাহস আছে—তাঁর যা নেই।

জোলা বলছেন, "এমন দুর্ভাগ্য হচ্ছে নেশার মত। যেন কোন ওষধির প্রভাবে আমার দেহ ও মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে,—কতখানি দুর্গতি ও নগ্নতার মধ্যে বাস করছি সেটা আর অনুভূতিতেও ধরা পড়েনা! সবাই কী মিথ্যাকথাই কয়! দারিদ্র্য কোন দিনই প্রতিভার জনক নয়! নিরাশা যাদের প্রতিভাকে বিলুপ্ত বা ব্যাভিচারী করেছে, তাদের সংখ্যা গুণে দেখলেই এই সত্য ধরা পড়বে।"

একদিন হাড়-কাঁপানো কন্‌কনে শীত। ঘরে মুখে তোলবার মত ক্ষুদ-কুঁড়োটি পর্য্যন্ত নেই। বন্ধুদের দ্বারে দ্বারে ধর্না দিয়ে খালি হাতে

তিনি ফিরে এলেন। নিজের গায়ের 'জ্যাকেটটা' খুলে প্রণয়িণীর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হতাশ ভাবে বললেন, "যাও, এইটে বাঁধা দিয়ে যা পাও নিয়ে এস।"

কেবল সার্ট প'রেই উপর-উপরি শীতের কয়েকটা রাত কেঁপে কেঁপে কেটে গেল। তারপর তাঁর শেষ 'ট্রাউজার' জোড়াও খোরাক যোগাবার জন্যে বাঁধা পড়ল। কিন্তু জোলার দুর্ভাগ্য-সঙ্গিনী তখনো অটল। তার জন্যেই বন্ধুরা তাঁকে ধার দিতে চাইত না। তাদের যুক্তি হচ্ছে, যার উপপত্নী আছে তার আবার ভাবনা কি?

অবশ্য এই অভাগী সঙ্গিনীটিও তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে যথাসাধ চেষ্টার ত্রুটি করতনা। ছেঁড়াখোড়া রংচঙে ন্যাকড়া, জানলার পর্দা ও বিছানার চাদর কেটে শেলাই ক'রে নিজের ও জোলার জন্যে সে অদ্ভুত সব পোষাক তৈরি করত। এবং সেই বিচিত্র পোষাক প'রে তাঁরা দুজনে রাজপথে অম্লানবদনে বেরিয়ে প'ড়ে, প্রথম শ্রেণীর বোহিমিয়ানের মতই অন্যান্য গণিকা ও সমশ্রেণীর জীবদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন।

তারপর এক শুভদিনে জোলা এক পিতৃবন্ধুর কৃপায় ছোট একটি চাকরি পেলেন। বিপুল আনন্দে তিনি ব'লে উঠলেন, "এতদিনে বোহিমিয়ার কবল থেকে মুক্তি পেলুম!"

ঊনবিংশ শতাব্দীর যে লোকগুলির প্রভাবে য়ুরোপীয় কথা-সাহিত্যের আদর্শ বদলে গিয়েছিল এবং এখনো অনেকের উপরে যাঁদের প্রভাব বিদ্যমান আছে, তাঁরা হচ্ছেন ফ্লবেয়ার, টুর্গেনিভ, জোলা, দোদে ও গনকোর্ট। পৃথিবীর প্রত্যেক দেশেই এঁদের চেয়ে সুপরিচিত নাম বড় বেশী নেই। এমন-কি বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজেও অনেক বাঙালী

লেখকের চেয়ে এঁদের নাম বেশী বিখ্যাত। রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ হিসাবে এঁদের চরিত্রের একটা দিক নগ্ন ক'রে দেখাতে চাই।

ঐ পঞ্চলেখকই ছিলেন উদর-পূজায় অসাধারণ। তাঁদের খাবার আসত দেশবিদেশ থেকে। হোটেলে ঢুকে সন্ধ্যা সাতটার সময়ে তাঁরা খেতে বসতেন এবং রাত প্রায় এগারোটা পর্য্যন্ত চলত তাঁদের পানাহার। 'বয়'রা কামরার ভিতরে ঢুকলেই সবাই উঠে তেড়ে যেতেন এবং ফ্লবেয়ারের ভারিক্কে গলার বিষম চীৎকারে সারা হোটেল কাঁপতে থাকত। পারী সহরের হোটেলওয়ালারা এই লেখক কয়জনকে যমের মত ভয় করত।

মদ্যের ও খাদ্যের প্রাচুর্য্য দেখে ভাবপ্রবণ জোলা এক-একদিন নিজের দুঃখ ও দারিদ্র্য পূর্ণ অতীত জীবনের কথা স্মরণ ক'রে বালকের মতন কেঁদে ফেলতেন। সকলে মিলে অনেক কষ্টে তাঁকে আবার শান্ত করতেন।

একদিন বিখ্যাত ফরাসী লেখক শাতোব্রিয়াঁর প্রসঙ্গ নিয়ে তর্ক উঠল —ফ্লবেয়ার ও দোদে তাঁর পক্ষে এবং জোলা ও টুর্গেনিভ তাঁর বিপক্ষে। সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত একটা পর্য্যন্ত সে কী তুমুল তর্ক! হোটেলের কর্ত্তৃপক্ষ স্তম্ভিত, 'বয়'রা ভয়ে তটস্থ, অন্যান্য খরিদ্দাররা হতভম্ব! মদের পিয়ালার পর পিয়ালা খালি হয়ে যাচ্ছে, তবু তর্কের অন্ত নেই—কি চীৎকার, কি গর্জ্জন, কি অশান্তি!………এম্‌নি ভাবে তাঁরা গোটা ফরাসী সাহিত্যকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিতেন।

একদিন উঠল প্রেমের প্রসঙ্গ।

জোলা বললেন, "আমার বয়স যখন দশ বছর তখন আমি এক দশ-

বছুরী মেয়ের প্রেমে পড়ি। সে ছিল ধনীর মেয়ে, মস্ত বাড়ীতে থাকত, খাসা পোষাক পরত,—আর আমি ছিলুম একেবারে গরিব। প্রতি রবিবারে গীর্জ্জায় তার সঙ্গে আমার দেখা হ'ত। তার চিত্ত জয় করবার জন্যে আমি হরেক-রকম ফন্দি আঁটতুম। ... ... বারো কি তেরো বছর বয়সে আমার দেহে যৌবনের সব চিহ্নই ফুটে উঠল। প্রেম তখনো চলছে। সব কথা ভদ্র-সমাজে ছাপার হরপে লেখা যায়না।"

টুর্গেনিভ বললেন, "আমি তখন ইতালীতে। পকেটে বেশী পয়সা নেই। একদিন সাঁকোর উপরে দাঁড়িয়ে নদীর দৃশ্য দেখছি, হঠাৎ একটি অচেনা তরুণী পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমার গায়ে কনুইয়ের গুঁতো মারলে। চমৎকার সন্ধ্যা! নদীর জলে হাঁসেরা খেলা করছে। ... ... আমরা দুজনে আলাপ করতে লাগলুম। গল্প করতে করতে এগিয়ে চললুম। সেদিন আমি প্রেমের আবেগে যেমন উচ্ছ্বসিত, উত্তেজিত ও বেপরোয়া হয়েছিলুম জীবনে আর কোনদিনই তেমন হইনি। ... ... আমরা একটি নির্জ্জন গোরস্থানে গিয়ে ঢুকলুম। তরুণী একখানা বড় সমাধি-শিলার উপরে গা এলিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ... ..."

ফ্লবেয়ারকে তখনকার নবীন লেখকরা গুরু ব'লে ডাকতেন। ফ্লবেয়ার বললেন, "প্রথম যৌবনে বন্ধুরা আমাকে কুস্থানে নিয়ে যেত। আমার মাথায় থাকত সিল্কের টুপী, মুখে থাকত চুরোট। সামনে যে রমণীকে পেতুম, তাকে নিয়েই ... ... চারপাশে বন্ধুরা দাঁড়িয়ে থাকত, সেজন্যে কোন সঙ্কোচ হ'ত না। এমন কি মাথার টুপী মাথায় এবং মুখের চুরোট মুখেই থাকত।" তারপরেই অট্টহাস্য!

সোদে বললেন, "ঐ রে, পুরুষদের কাছে তুমি হও নরবিদ্বেষী, আর মেয়েদের কাছে হও ভাবপ্রবণ !"

ফ্লবেয়ার বললেন, "যা বলেছ ! এমন কি যুবতী ঝীকেও আমি 'ছোট্ট পরী' ব'লে না ডেকে থাকতে পারিনা। এগারো বছর বয়সে আমি প্রথম প্রেমে প'ড়েছিলুম। ... ...

"উত্তর মিশর—রাত্রি যেখানে কয়লার মত কালো ! ছ'দিকে নীচু নীচু কুঁড়েঘর, মাঝে পথ দিয়ে চলেছ তুমি। অন্ধকারের ভিতর থেকে কুকুররা এমন ক্রুদ্ধস্বরে গর্জ্জন করছে, যেন তোমাকে ভক্ষণ করতে চায় ! চালে মাথা ঠুকে যায়—এমনি একখানা কুঁড়ের ভিতরে তোমাকে নিয়ে যাবে। ... ... সেইখানে গিয়ে দেখবে, মাটির উপরে শুয়ে আছে এক রমণী, গায়ে তার সেমিজ ছাড়া আর কিছু নেই—তার দেহের ছই পাশ বরফের মত ঠাণ্ডা-কন্‌কনে। ... ... এই রমণীর পাশে গিয়ে শয়ন কর, উপভোগের সময়েও সে স্থির হয়ে থাকে পাথরের মত। ... ... মন অনুভব করে আনন্দ, অনন্ত আনন্দ !"

ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যের বস্তুতান্ত্রিক গুরুদেবের এই কথাগুলির পরে আর কোন কথা বলা চলে না।

পৃথিবীর সব শিল্পীকেই কেউ একই গোত্রভুক্ত করতে চাইবে না। একসঙ্গে শিল্পী ও মানুষ হিসাবে অতুলনীয় অনেকেরও নাম করা যায়। এখানে অন্তত একজনের নাম করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ।

নেপোলিয়নের বাণী

সকলেই জানেন নেপোলিয়ন সাধারণ সৈনিকের মতন গোঁয়ার-গোবিন্দ ছিলেন না। পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর মতন একাধারে যোদ্ধা ও বোদ্ধা পুরুষ দ্বিতীয় পাওয়া যায় না একমাত্র সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ছাড়া। কেবল যুদ্ধনীতি নয়—রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মতত্ত্ব, দর্শনতত্ত্ব, সাহিত্য ও আর্ট প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধেই তাঁর চিন্তাশীলতা ছিল অসাধারণ। প্রেম, নারী, বিবাহ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁর নিজের যা মতামত ছিল, নীচে তার কতক-কতক তুলে দিলুম। এর সঙ্গে একালের অনেকেরই মন হয়তো সায় দিতে চাইবে না, তবু নেপোলিয়নের মতামত হিসাবে এগুলির মূল্য সামান্য নয়।

নেপোলিয়ন বলছেন :—

প্রেম কি? তীব্র মানসিক উত্তেজনা। যার বশীভূত হ'লে মানুষ সমগ্র বিশ্বকে ত্যাগ ক'রে কেবল প্রেমাস্পদকেই দেখতে চায়।...... এমন একপেশে মনোবৃত্তির পরিচয় দেবার জন্যে নিশ্চয়ই আমি গঠিত হই নি।......আমি কখনো সত্যিকার প্রেমে পড়তে চাই-ও নি, পারি-ও নি। প্রেম সৃষ্ট হয়নি আমার মতন চরিত্রের জন্যে। আমার উপরে আছে রাজনীতির পরিপূর্ণ দাবি। আমার রাজসভায় আমি কখনো বাড়ী-ভর্ত্তি নারী দেখতে ইচ্ছা করি না। নারী-প্রীতির জন্যে চতুর্থ হেন্‌রি ও চতুর্দ্দশ লুই যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছিলেন।

নারীর সঙ্গে আমরা বড়-বেশী ভালো ব্যবহার করি। এবং তার ফলে সব নষ্ট ক'রে ফেলি। নারীদের পুরুষের সমান অধিকার দিয়ে আমরা অত্যন্ত অন্যায় ক'রেছি। আমাদের চেয়ে প্রাচ্য দেশের বাসিন্দাদের সুবুদ্ধি আছে, তাই তারা নারীকে পুরুষের সম্পত্তি ব'লে মনে করে। প্রকৃতি যে নারীকে পুরুষের দাসী রূপেই গঠন ক'রেছে, এটা হচ্ছে পরম সত্য কথা। যার রুচি বিকৃত, কেবল সেই-ই নারীর শাসনে আত্ম-সমর্পণ কর'তে পারে। নারীদের আমরা যেটুকু সুযোগ দি, আমাদের বিপথে নিয়ে যাবার ও গোলামে পরিণত করবার জন্যে তারা সেই সুযোগের অসদ্ব্যবহার করতে ছাড়ে না। মাঝে মাঝে হয়তো এমন এক-একজন নারী দেখি, যারা পুরুষের হিতসাধন করে; কিন্তু তার বদলে দেখা যায় এমন শত শত নারী, যাদের প্রভাবে প'ড়ে পুরুষ অন্যায় কাজ করে পদে পদে। পুরুষ, নারীকে পেয়েছে সন্তান প্রসব করবার জন্যে। কিন্তু কোন পুরুষের পক্ষে কেবল একটি নারী এই কাজের জন্যে যথেষ্ট নয়। নারী যখন গর্ভবতী বা পীড়িতা হয় বা স্তন্যদান করে, তখন সে আর পত্নীরূপে গণ্য হ'তে পারে না। যখন সে সন্তান প্রসবে অক্ষম হয়, তখনো তাকে পত্নী ব'লে মনে করা যায় না।

নারীদের অভিযোগ করবার কি হেতু আছে? তাদের যে আত্মা আছে, এ-কথা তো আমরা অস্বীকার করি না—যদিও কোন কোন দার্শনিক এ সম্বন্ধেও সন্দিহান! তারা আমাদের সমান অধিকার চায়! কিন্তু এ হচ্ছে পাগলের দাবি! নারীরা আমাদের সম্পত্তি—আমরা তাদের নই। আমাদের জন্যে তারাই সন্তান প্রসব করে, কিন্তু তাদের জন্যে আমরা করিনা। অতএব পত্নী হচ্ছে স্বামীর নিজস্ব সম্পত্তি—যেমন ফলের গাছ

হচ্ছে বাগানের মালিকের সম্পত্তি। যখন কোন স্বামী তার স্ত্রীর কাছে অবিশ্বাসী হয়, তখন সে অবশ্য স্ত্রীর কাছে নিজের দোষ মেনে দুঃখপ্রকাশ করিবে। স্ত্রীর রাগ জল হয়ে যাবে, স্বামীকে ক্ষমা ক'রে আবার সে ঘর-সংসারের কাজে নিযুক্ত হবে। কিন্তু স্ত্রী যদি অবিশ্বাসিনী হয়, তা'হলে সেটা স্বতন্ত্র কথা। সে দোষ মানতে ও দুঃখ প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু তবু, তারপরেও এখানে চিরদিনের জন্যেই একটা 'কিন্তু' থেকে যায়।

নারী মানুষের জান্তব বাসনার অভাব পূরণ করে। নারী হচ্ছে পুরুষের স্বাভাবিক জীবন-সঙ্গিনী এবং কেবল পুরুষের জন্যেই নারীর সৃষ্টি। সুতরাং পুরুষের উচিত হচ্ছে, নারীকে কেবল নারীত্বের জন্যেই গ্রহণ করা এবং তার প্রতি একান্ত ভাবেই আসক্ত হয়ে থাকা। সে যদি তাকে আপনারই অপরাংশ ব'লে মনে করে এবং তার কাছে নিজের হৃদয়কে অকুণ্ঠিত ভাবে উন্মুক্ত ক'রে দেয়, তবে তারা দুজনেই দুনিয়ার বিশৃঙ্খল লালসার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রাণ নিয়ে দাঁড়াতে এবং জীবনের সমস্ত মাধুর্য্যকে উপভোগ করতে পারবে। যৌনমিলনের মোহিনী-মায়া কল্পনাকে সুন্দর, দুঃখ-যন্ত্রণাকে শান্ত ও জীবনের আনন্দকে সুবিচিত্র ও মধুরতর ক'রে তোলে।

যে-সব হতভাগ্য অথচ নিষ্পাপ প্রাণী সারা জীবন অপমানের বোঝা বহন করে, সেই অবৈধ সন্তানদের অবস্থা উন্নত করবার জন্যে আমি সাধ্যমত চেষ্টা ক'রে এসেছি। কিন্তু এদিকে অতিরিক্ত ঝোঁক্ দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাহ'লে বিবাহ-বিধির মূল আল্‌গা হয়ে পড়বে। কেননা, বিবাহ না করলেও সন্তান যদি বৈধ ব'লে বিবেচিত হয়, তবে খুব কম লোকেই বিবাহ-বন্ধনে বাঁধা পড়তে রাজি হবে।

ইতিহাসের সব যুগেই দেখা যায়, গণিকাদের বিরুদ্ধে মানুষ অশ্রান্ত ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে এসেছে। পৃথিবীতে তবু কোনকালেই গণিকার অভাব হয় নি। হওয়া উচিতও নয়। কারণ গণিকার অভাব হ'লে, পথে সুচরিত্র নারী দেখলে পুরুষরা তাকে আক্রমণ করতে ছাড়বে না। (অর্থাৎ গণিকারা কামুক পুরুষদের লালসাকে কতকটা প্রশান্ত রাখে এবং সেই জন্যেই তারা সমাজের পক্ষে উপকারী)।

এই বিশ্বে যা-কিছু দেখা যায়, সমস্তই ইঙ্গিতে ভগবানের অস্তিত্বকে জানায় একথা খুব-ই সত্য। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মই যে মানুষের সৃষ্টি, এটাও খুব স্পষ্ট। পৃথিবীতে কেন এত বিভিন্ন ধর্ম্ম? কেন আমাদের ধর্ম্ম চিরদিনই এখানে প্রচলিত ছিল না? ধর্ম্ম সৃষ্টির আগে পৃথিবীতে যেসব মানুষ বাস করত, তাদের অদৃষ্টে কি হয়েছে? প্রচলিত প্রত্যেক ধর্ম্মই পরস্পরকে কলঙ্কিত করবার চেষ্টা করে কেন? তারা কেন সব দেশেই চিরদিন পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে এসেছে? এথেকে প্রমাণিত হ'চ্ছে যে, মানুষের প্রকৃতি সব দেশেই সমান এবং ধর্ম্মধাজকরা সব দেশে সব সময়েই জাল-জুয়াচুরি ও মিথ্যার কারবার না ক'রে পারে নি।

কোথা হ'তে আমি এসেছি, কোথায় আমি অবস্থান করছি, এবং কোথায় আমরা চলেছি? এ-সব প্রশ্নের উত্তর আমাদের ধারণার মধ্যে ধরা পড়েনা। তবু ঐ প্রশ্নই হচ্ছে সব! আমি হচ্ছি কর্ম্মীর হাতের কাজ, আমাকে নিয়ে কি করা হবে কর্ম্মীই তা জানেন—আমি জানি না। তবু ধর্ম্ম-ভাব এমন সান্ত্বনাদায়ক যে, যার তা আছে সে স্বর্গের আনন্দ বহন করে।

এই সব নানা কারণে, সিংহাসনে আরোহণ ক'রেই আমি ধর্ম্মকে আবার প্রতিষ্ঠিত করেছি। (ফরাসী-বিপ্লবের পর ফরাসীরা দেশ থেকে ধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করেছিল)। ধর্ম্মকে আমি মূলের মত, প্রাথমিক ভিত্তির মত ব্যবহার করেছি। আমার চক্ষে ধর্ম্ম হচ্ছে সুনীতি, সত্য ও বিশ্বাসের রক্ষক। এবং মানুষের মন এমন ভাবেই গঠিত যে, অনন্ত ও অলৌকিকের প্রতি আস্থা স্থাপন করতে না পারলে সে সুখী হয় না।

কিন্তু যারা ধর্ম্ম পচারের ভার নেয়, তাদের অন্যায় আচরণ দেখে ও হাস্যকর কথা শুনে মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হবে কেমন ক'রে? আমার চারিদিকে যে-সব প্রচারক রয়েছেন, তাঁদের মুখে সর্ব্বদাই শুনছি তাঁরা এই হীন পৃথিবীর কেউ নন, অথচ ঐহিক সুখ-সুবিধা লাভের জন্যে অষ্ট-প্রহরই তাঁদের লালায়িত হয়ে থাকতে দেখি! পোপ হচ্ছেন স্বর্গীয় ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান পুরুষ, কিন্তু সব-সময়েই তিনি পৃথিবীকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকেন! (এই সব নানা কারণে পোপের পবিত্রতার উপরে নেপোলিয়নের একটুও বিশ্বাস ছিল না ব'লেই তিনি একাধিকবার তাঁর রাজমহিমার সামনে পোপকে মাথা নত কবতে বাধ্য করেছিলেন!)

আমি কি বিশ্বাস করি? আমি বিশ্বাস করি যে, সূর্য্যকরের দ্বারা উত্তপ্ত এবং বৈদ্যুতিক প্রবাহের দ্বারা একত্রে বদ্ধ মাটির তাল থেকে মানুষের উৎপত্তি। গরু, ছাগল প্রভৃতি জন্তুদের দেহ কি রাসায়নিক যৌগিক পদার্থের দ্বারা গঠিত নয়? মানুষের দেহও যখন ঐ ভাবেই গড়া, তখন অনায়াসেই বলা চলে যে, মানুষের দেহও হচ্ছে পঞ্চভূতাত্মক বস্তু, কেবল অন্যান্য জন্তুর চেয়ে তাদের গঠন অধিকতর নিখুঁত। ভবিষ্যতে মানুষের চেয়েও নিখুঁত দেহ নিয়ে অন্য-কোন জীব পৃথিবীতে আত্মপ্রকাশ করবে না, এ-কথা কে ব'লতে পারে?

শিশুর আত্মা কোথায় ? আত্মা তো দেহের অনুগমন করে ;—শিশুর বয়সের সঙ্গে সে বর্দ্ধিত হয় এবং বৰ্দ্ধক্যের ক্ষয়ের সঙ্গে সে ক্ষুদ্রতর হয়। আত্মা অমর ও অক্ষয় নয় !

তবু ভগবানের ধারণা হচ্ছে সব-চেয়ে সহজ ! এই বিশ্ব নিখিল কে সৃষ্ট করলে ? এই প্রশ্ন এবং উত্তরেব মাঝখানে যে বিপুল রহস্যের বিরাট যবনিকা দুলছে, তার ওপারে যাবার শক্তি আমাদের আত্মার এবং ধারণার মধ্যে নেই। এখানেই উচ্চতর শক্তির আভাস পাওয়া যায়। … · সৈনিকরা কি ভগবান মানে ? তাদের চারপাশে এত মৃত্যুর ছড়াছড়ি !

Nartes-এর বিসপ্‌কে আমি সুধিয়েছিলুম, মরণের পরে জানোয়ারবা কোথায় যায় ? জবাব পেলুম—'জানোয়ারদের আত্মা হচ্ছে আর এক রকমের, তাই তাদের জন্যে বিশেষ এক নরকের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

পৃথিবী-সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গেই যদি ধর্ম্ম সৃষ্ট হ'ত, তাহলে আমারও ধর্ম্মে আস্থা থাকত। কিন্তু Socrates, Plato, Moses ও Mohammed-এর মতামত প'ড়ে আমি ধর্ম্ম-বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। ধর্ম্ম মানুষের কল্পনা।